# মাটির মাশুল

## মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মাটির মাশুল প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ

# মাটির মাশুল

ভোরে আজ চারিদিক ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেছে। অল্প দূরেও নজর চলে না। এমনই কুয়াশায় রাত্রি শেষ হয় আজকাল, সারাদিন রোদ ভোগের পর আবার হিমহিম কুয়াশার যেন আভাস মেলে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে। ভোরের কুয়াশা কাটতে বেলা হবে, তখন দেখা যাবে চারিদিকে মাটি ঢেকে গেছে আগামী ফসলের তরুণ সবুজ চারায়। ছড়ানো বীজ থেকে এলোমেলোভাবে জন্মেছিল শিশু, গোছায় গোছায় সাজিয়ে রোপণ করেছে চাষি। সারাদিন কাঁচা সবুজ শিষগুলি বাতাসে দোলে। নবাগত উত্তুরে বাতাস এখনও খেয়ালি, চপল। থেকে থেকে হঠাৎ থেমে যায়, বায়ু বয় পুব থেকে, তা-ও আবার হঠাৎ দিক পরিবর্তন করে বসতে শুরু করে দখিনা হয়ে ! ধানের শিষ টিপলে এখন দুধ বেরোয়, উপোসি মানুষ-মাদের স্তনের দুধের চেয়ে ঘন, বুঝি বা মিষ্টিও। চাষিরা বলে যে তা হবে না কেন, মানুষ-মায়ের বুকে দুধ তো আসে মাটি-মায়ের দানা-বাঁধা এই দুধ খেয়েই।

বাপ রে, কী কুয়াশা। ভুঁই ফুঁড়ে মেঘ উঠেছে মন করে যেন।

ভূষণ আর রসিক আর তোরাব আলিকে। দাওয়ায় বসে চেনা যায় না বিশ-পঁচিশ হাত দূরে মাটির রাস্তায় কে হেঁটে যাচ্ছে, এদিকের ডোবা থেকে উঠে আসছে কোনো বাড়ির বউ।

রসিক বলে, ধরণী ব্যাটা ঘুমোবে বেলা তক্। একটু দেরি করেই রওনা দি মোরা, না কি বলো মিয়া ?

রসিক ভূষণের বোনাই, পাড়াতেই খানিক তফাতে তার ঘর। তোরাব এক রকম প্রতিবেশী ভূষণের, দুজনের বাড়ির মধ্যে ব্যবধান শুধু একটা বাঁশঝাড় আর কয়েকটা কুলগাছের।

দেরি হয়ে যাবে না ? কোনও একটা ছুতা করে আজ যদি কর্জা না দেয় ধর ?

তোরাব বলে উদ্‌বেগের সঙ্গে। ধরণী তরফদার ধান কর্জা না দিলে কাল পরশু ওদের দুজনের ঘরেও উপোস শুরু হয়ে যাবে কিন্তু তোরাব আলির ঘরে গতকাল থেকেই এক দানা চাল নেই। উপোস চলছে।

ভূষণ বলে, দেবার মতলব না থাকলে রাত থাকতে গিয়ে ধন্না দিলেও দেবে না। মতলব থাকলে যখনই যাও মিলবে।

সে কথা ঠিক।

আগেকার দিনে ধরণীর কাছে কর্জা চাইতে যাবার দরকার হলে এরাই হয়তো একজন চুপিচুপি আরেক জনের আগে গিয়ে নিজের জন্য কর্জটা আগে ভাগে বাগিয়ে নেবার চেষ্টা করত। কিন্তু আজ চাষিরা প্রায় সকলেই টের পেয়েছে ওতে কোনো ফল নেই, কে আগে এল তোষামুদে কথা কইল বা কান্নাকাটি করল সে সব বিচার করে না ধরণী তরফদার। যাকে না দেবার তাকে কিছুতেই দেয় না, যাকে দেবার তাকে দেয়, সমান বাঁধনে বাঁধে। ভান্ডারও তার অফুরন্ত, তার কাছে কর্জ বাগানো মন্বন্তরের রিলিফখানার খয়রাত পাওয়া নয় যে আগে গিয়ে মারামারি কামড়াকামড়ি না করলে ফুরিয়ে যাবার ভয়। তবে কি না আজও না খেয়ে থাকতে হলে তোরাবের বিশেষ মুশকিল আছে। বউটা তোরাবের আসন্ন-প্রসবা, বড়ো কমজোরি হয়ে পড়েছে শরীরটা তার এমনিতেই। সব জেনে বুঝেও উদ্‌বিগ্ন মনটা তাই ধৈর্য মানে না, সাধ যায় ছুটে গিয়ে অন্তত যাচাই করে আসতে যে বউটা আজ একটু ভাত পাবে কী পাবে না।

দেড় ভাগি চাপাবে ঠিক। না তো কর্জা দেবে না মন করে।

তা মানবো না মোরা।

না, তা মানবো না, আল্লার কিরে !

এক মুহূর্তে তোরাব যেন ভয়-ভাবনা-উদ্‌বেগ সব ভুলে যায়, হাঁটুতে জোর চাপড় মেরে বলে, পোরা সুদের এক কুনো বাড়তি মানব না, না দেয় কর্জ না দেবে।

গতবছর ফসল কাটার দশ-বারোদিন আগে বিপদে পড়ে দেড় ভাগি শর্তে তোরাবকে ফজলু মিয়ার কাছে, ধান নিতে হয়েছিল সে জ্বালা আজও সে ভোলেনি। বর্ষাকালে ধান কর্জ মেলে দেড় ভাগিতে, ফসল ঘরে উঠলে দেড় গুণ শোধ, দেবার সময় তবু ভাবা চলে যে এতগুলি মাস ঋণটা ভোগ করা গেছে। এখন ফসল কাটতে আর মাসকানেকও বাকি নেই আজ ও শর্ত চাপাতে চাওয়া তো দিনে ডাকাতির শামিল।

চলো মিয়া দেখি অদেষ্টে কী আছে। গরজ তো মোদের, ও ব্যাটার কী ? কলকেতে সুপাবিব মতো ছোটো একগুলি তামাক দিয়ে হাতের তালুতে নারকেল ছোবলা পাকাতে পাকাতে রসিক বলে।

বটে না কি ? তাই ভাবলে তুমি ? ভূষণ বলে ব্যঙ্গের সুরে, ও ব্যাটার কী ? কর্জ না দিলে ওর ঘরের ধান ঘরে রইবে, বাড়বে এক দানা ? উয়ার কারবার এই, মোদের চেয়ে উয়াব কর্জ দেবার গরজ বেশি ছাড়া কিছু কম নাই।

ঠিক। গুঁটি মেরে বসে থাকে মোদের খেলাতে, তোরাব বলে, মোরা হার মানি, নয় তো—

কুয়াশা নড়ে না, হালকা হয় না। চালা থেকে টপটপ জল পড়ছে। হাত বদল কবে তাবা কলকেতে কয়েকটা ছোটো-ছোটো আর একটিমাত্র বড়ো টান দিয়ে তামাক খায়, চিন্তিতভাবে তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে। বাসনে ঘা দিয়ে বাজাবাব আওযাজ আসে অন্দব থেকে, এইভাবে চিবদিন ভেতরের ডাক আসে ভূষণের। ছেলেটার জ্বর এসেছিল পরশু, কাল বাত্রে খুব বেড়েছিল জ্বটা, গা যেন তপ্ত খোলার মতো পুড়ে যাচ্ছিল। এখন খুব ঘাম দিয়ে তাড়াতাড়ি জ্বটা ছেড়ে যাচ্ছে, ছেলেটা ছটফট করছে গোঙিয়ে গোঙিয়ে। ছেলের কাছে একটু বসে ভূষণ উঠে আসে। তাব মুখ আবও কালো আর গম্ভীর দেখায়।

হাসপাতালে যাবে না একবার ? তার বউ শুধায়।

হাঁ, হাসপাতাল হয়ে ফিরব।

সে ছাড়া বাড়িতে দ্বিতীয় পুরুষ নেই ভূষণের, পাঁচটি শুধু স্ত্রীলোক। সব ঝঞ্ঝাট সব হাঙ্গামা তাকে পোয়াতে হয় একা।

বাইরে এসে সেই এবার গরজ করে বলে, চলো রওনা দি, বসে থেকে কী লাভ ?

এই সোনামাটি গাঁয়েরই দীঘিপাড়ায় ধরণী তরফদারের টিনের ঘর আর দালান-কোঠায় মেশানো বাড়ি। ভূষণের বাড়ি থেকে প্রায় আধ ক্রোশ তফাতে। রাস্তায় তারা নাগাল ধরে পিনাক সামন্তের, সেও কুয়াশা ভেদ করে গুটিগুটি হেঁটে চলেছে তরফদারের বাড়ির উদ্দেশে। এমনি অভাব চারিদিকে যে সবারই যেন গতি ওই একদিকে যেখানে একজনের খামারে গুদামে ধান গাদা হয়ে জমে আছে। মানুষটার বয়স যে খুব বেশি তা নয়, অকালে বুড়িয়ে জীর্ণ আর বাঁকা হয়ে গেছে সত্তর বছরের বুড়োর মতো। শোনা গেল, তরফদারের কাছে তার প্রয়োজন ধান কর্জ নেওয়া নয়, বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো এক চোরাগোপ্তা এক তরফা মামলায় জমি নিলামের নোটিশের প্রতিবাদে কাকুতি-মিনতি করা যদি কিছু সুরাহা হয়। তার ছেলে কৈলাস গেছে বিদেশে খাটতে, ফসল কাটার সময় আরও নিকট হলে ফিরবে, এ সময় আচমকা এই বিপদ ঘটায় কী করবে ভেবে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে পিনাক সামন্ত।

বলে, মরণ হলে হাড় জুড়াত, অদেষ্টে মরণ নাই। না ভাই, অদেষ্টে মরণ লেখেনি মোর। সেই যে গোল বাধালে কৈলেস, নাথুর হয়ে সাক্ষী দিলে ঘর জ্বালানোর মামলায়, সে রাগটা ঝাড়লে তরফদার।

বলে, মোর খেমতায় কুলোয় ? ছুটোছুটির শক্তি আছে ? মরে মরে বেঁচে রই শুধু মন্দ অদেষ্ট বলে।

সবাই জানে সব, বোঝেও সব। আস্তে পা ফেলে পিনাকের সাথে গতি মিলিয়ে তারা হাঁটে। ধরণীকে গিয়ে ধরে পড়লে যে কিছু হবে না এ জানা কথা। ভাঙা জীর্ণ শরীর নিয়ে ছুটোছুটি করে পিনাককেই ঠেকাতে হবে নিলাম, লড়তে হবে মিথ্যে মামলা ফাঁস করতে, অবশ্য যদি সে লড়ে, লড়তে পারে। কৈলাস এসে কেঁদে-কেটে মাপ চেয়ে নাকে খত দিলে বড়োজোর আপস হবে একটা, দয়া করে কিছু কমে সমে রেহাই দেবে ধরণী। নয়তো যাবে জমি নিলাম হয়ে। এ তো জগতে হরদম ঘটছে।

ভূষণ শুধায়, কৈলাসের শ্বশুর না মরো-মরো হয়েছিল ?

মরল কই ? পিনাক বলে দারুণ হতাশায়, যে মরলে ভালো সে কি মরে ? উয়ার মরণ নাই, মোর মরণ নাই, মোরা চিরজীবী হয়ে রইব ?

কৈলাসের শ্বশুরের দুটি মাত্র মেয়ে, সে মরলে তার জমিজমা ঘর-দুয়ার ভাগাভাগি করে মেয়েরা পাবে। তার অসুখ-বিসুখের খবর পেলেই জামাই দুজন দেখতে ছুটে যায়, এমনিও যায়। পূজার পর থেকে কঠিন রোগে পেড়ে ফেলেছিল, সকলেই আশা করেছিল এবার তার ভব যন্ত্রণার পালা শেষ হবে। কিন্তু বুড়ো আবার বেঁচে উঠেছে।

পিনাকের সঙ্গে হেঁটে দীঘিপাড়ায় পৌঁছোতে পৌঁছোতে কুয়াশা খানিকটা হালকা হয়ে আসে, এবার তাড়াতাড়ি কেটে যাবে। দীঘিপাড়ায় ঘনবসতি, টিন বা ঘড়ের চালার বাড়িই বেশি, দালানও এখানে ওখানে চোখে পড়ে। সোনামাটির এই দীঘিপাড়া ও কুয়াতলাতেই গাঁয়ের সচ্ছল সম্পন্ন এবং গরিব অধিকাংশ ভদ্র গৃহস্থের বাস। দীঘিপাড়াতে বড়ো জোতদার আছে আরও দুজন, তবে ধরণীর মতো বড়ো কেউ নয়, ওদের দুজনের মিলিয়ে যত হবে তার চেয়ে বেশি মাটি ও বেশি চাষির সে ভাগ্যবিধাতা। পশ্চিমে কিছু তফাতে বুড়ো বটগাছটার খানিক আড়ালে ইন্দু শাসমলের বাড়ির সামনেও কর্জপ্রার্থী চাষি কয়েকজন জমা হয়েছে দেখা যায়। অন্য জোতদার আশু পট্টনায়কের বাড়িটা আড়ালে।

ধরণী তখনও দর্শন দান করেনি, তবে আর খুব বেশি দেরি যে তার হবে না অন্দর থেকে সদরে আসতে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তক্তপোশের ফরাশ ঝেড়ে বাঁধানো হুঁকোটা রেখে গেছে কানাই, বুড়ো লোচন সরকার চোখে চশমা এঁটে খেরো বাঁধানো খাতা খুলে বসেছে, ধরণীর ভাগনে আচমকা এসে উঁকি দিয়ে গেছে।

অনেকে মেঝেতে উবু হয়ে বসে আগে থেকে অপেক্ষা করছিল, প্রায় তাদের সাথে সাথেই ভিন গাঁয়ের আরও দুজন এল। তাদের মধ্যে রাজেন দাসকে দেখে একটু অবাক লাগে সকলের, তার অবস্থা ভালো বলেই জানত সকলে, বছরের কোনো সময়ে ভাতের অভাব হয় না। ধান কর্জ চাইতে এসেছে রাজেন দাস, না টাকা ? যেমন বিপন্ন ভাব তার, কারও দিকে না তাকিয়ে যে ভাবে এক পাশে দাঁড়িয়ে চোখ পেতে রেখেছে কদমগাছটার, দেখে মনে হয় অনুগ্রহই বুঝি চাইতে এসেছে যে কাজটা তার মোটে অভ্যস্ত নয়। কাল্লু আর ফকিরই বা কেন এসেছে কে জানে ? নিঃস্ব পথের ভিখারি হয়ে গেছে দুজনেই ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে, এক কাহন খড়ও নেই যে ওদের কোনো দয়া করে ধরণী সুদে আসলে ফিরে পাবার প্রত্যাশা করতে পারবে।

পরস্পরের মধ্যে কথা চলতে থাকে ধীরে ধীরে, নতুন কিছু জানার বা বলার থাকলে জিজ্ঞাসা ও জবাব, দু একটি শব্দে আপশোশ বা সমবেদনা প্রকাশ। প্রাণখোলা কুশল প্রশ্নের পালায় মন্দা

এসেছে। চিরকালের স্থায়ী দুঃখ দুর্দশার কথা কেউ বলাবলি করে না, কারণ কারও অজানা নেই কার দুর্ভোগের জের চলছে তো চলছেই, সে হিসাবে সবাই তারা সমান দুর্ভাগা, কমবেশি যদি হয়তো সেটা সাময়িক, জোয়ার-ভাটার খেলা মাত্র। আজ যে দুদিনের অন্নসংস্থান করেছে, দুদিন বাদেই তার উপোস। রাজেন দাস পোড় খায়নি, তার লজ্জা করতে পারে। ঘরে অন্ন না থাকাটা দশজনের জেনে ফেলার মধ্যে যে লজ্জার কিছু থাকতে পারে, অপৌরুষের বা অপদার্থতার প্রমাণ সেটা, অন্যেরা তা বহুকাল আগেই ভুলে গেছে !

ভূষণের জিজ্ঞাসার জবাবে রাজেন দাস একটু কাঁচুমাচু হয়েই বলে, একটু কাজে এয়েছি। দরকার আছে একটা।

দরকার ছাড়া কেউ যেন এখানে আসে !

শ্রীনাথ মাইতি বলে, আর দাদা, কপাল ! মলজোড়া ফের বাঁধা দিতে এয়েছি, ঘরে হাঁড়ি চড়া বন্ধ।

বলাবলি যা হয় সব চাষাড়ে কথা। হাটে হাটে ধান-চালের লাটসাহেবি দর, কেমন হবে এবারের ফসল, ভাগ, আবোয়াব আদায়, জুলুম ইত্যাদির কথা। আর সেদিন রামপুরে পত্তনিদার মদন শাসমলের লোকেব সঙ্গে চাষিদের যে মারামারিটা হয়ে গেল সেই আলোচনা। রাখাল একটা নতুন খবর দিয়েছে আজ, মদন শাসমলের ভাইপো না কি জখম হয়েছিল দাঙ্গায়, হাসপাতালে মারা গেছে। তার চেয়েও জবর একটা খবর শুনে এসেছে তিনু, সত্য কি মিথ্যা জানে না। হাঙ্গামার পর পুলিশ এসে রামপুরে ধর-পাকড়-জুলুম চালাচ্ছিল, হঠাৎ না কি পুলিশ চলে গেছে গাঁ ছেড়ে। একেবারে হঠাৎ, সকালেও দলকে দল পুলিশ হাজিব ছিল, বেলা খানিক বাড়তে না বাড়তে মার্চ করে চলে গেল স্টেশন রোডের দিকে। তিনুর এই অদ্ভুত কাহিনি নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে। সবাই যে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করবে তার সময় পাওযা গেল না। ধরণী এল বেঠকখানায়।

বলল, বেশ, বেশ। তোমরা এযেছ দেখছি। তা বেশ, তা বেশ। জয দুর্গা শ্রীহবি। তামাক আনতে বুড়ো হলি শালার পুত ?

ঘরের মধ্যেই ভেতরেব দরজার কাছে দাঁড়িযে কানাই কলকেতে ফুঁ দিচ্ছিল, নজর পড়ায় ধবণী বলল, এই যে এনেছিস !

একেবারে যে মোটা গোলগাল তা নয়, নাদুস-নুদুস চেহাবা ধবণী তরফদারেব, বেঁটে বলে মোটা দেখায় বেশি। টানা চোখ, মুখখানা থ্যাবড়া না হলে অপরূপ মানাত, আর যদি ভুরু না হত দামাল মোচের মতো ঘন। টানা চোখে একবার সে তাকিয়ে নেয সবার দিকে, কে কে এসেছে, কেন এসেছে, মোটামুটি আন্দাজ করে নিতে। দিনকাল বড়ো খারাপ পড়েছে, একদিন সকালে বৈঠকখানায় নেমে যদি দ্যাখে যে এক দল আধিয়ার হাতিয়ার নিয়ে অপেক্ষা করছে, মোটেই সে আশ্চর্য হবে না। ব্যবস্থা অবশ্য সে করে রেখেছে আত্মরক্ষার। দু নলা বন্দুকে ছর্‌রা টোটা ভরে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে ভেতরের দরজার ওপাশে, রামদা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে রঘু আর বিষ্ণু। তাছাড়া, লোকজন সকলকে বলাই আছে যে, বৈঠকখানায় একটু হট্টগোল শোনামাত্র যে যেখানে থাকে ছুটে আসবে দা লাঠি যা পায় হাতের কাছে তাই নিয়ে।

তবু, বলা যায় না। সব সময় মনে একটা আতঙ্ক জেগে থাকে। যা দিনকাল পড়েছে।

রাজেন যে ? খবর কী ? রাজেনের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ হুঁকো টেনে লোকটা যে কে চিনবার যথাসাধ্য চেষ্টার পর আচমকা ধরণী প্রশ্নটা করে বসে। ধরণী তার জন্ম থেকে চেনা।

একটু দরকার ছিল।

বোসো। জয় দুর্গা শ্রীহরি। হাই তুলে তুড়ি দেয় ধরণী, শরীরটা ভালো নেই।

হুঁকে টেনে যায় ধরণী, অর্ধেক চোখ বুজে, চুপচাপ। বিষয়কর্মে তার যেন মন নেই, এতগুলি লোক কেন তার কাছে এসেছে সে যেন জানতেও চায় না, পরম গভীর কোনো এক অপার্থিব চিন্তায় সে যেন ডুবে গেছে।

নিজে থেকে সে কিছু বলবে না, তার গরজ নেই, এ জানা কথা। তোরাব একটু সামনে এগিয়ে বলে, মোরা কর্জের জন্য এয়েছিলাম কত্তা।

কর্জ ? তা বেশ। ফজলু মিয়ার খবর কী ?

তেনা ভালো আছেন। তা, তেনা কাত্তিকে দেড় ভাগি আপস চান তাই আপনার কাছে এয়েছি।

বটে ? তা বেশ। কাত্তিকে দেড় ভাগি অন্যায় জুলুম বটে।—ধরণী যেন মাটির পৃথিবীতে ফিরে এসেছে হঠাৎ, মুখটা দেখায় গম্ভীর।—লোচন, ধান কি আছে কর্জ দেবার মতো ?

কিছু আছে। অল্প-স্বল্প দেয়া যায়।

তখন ধরণী বলে, শোনো বলি, কাত্তিকে দেড় ভাগি চাইব না আমি, আমার বাপু বিবেক আছে। ও সব গোলমালে কাজ নেই। ধানের বাজার দরে ধান দেব, টাকায় সুদ ধরব—ধরণী গলা খাঁকরায়, সুদখোর মহাজন হলে চার আনা ধরত, আমায় দু আনা দিয়ো, তাই ঢের।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় উপস্থিত সকলে। সকলে মরিয়া হয়ে প্রাণপণে নাড়াচাড়া করে প্রস্তাবটা মনে মনে। লোকা চাষাভুসো মানুষ, মানে বুঝেও ভাববার চেষ্টা করে কথাটার যে মানে বুঝেছে তা হয়তো ভুল, অন্য মানে আছে।

তোরাব বলে, কত্তা ?

রাজেন দাস বলে, এটা কী বলছেন ?

কেন ? ধরণী যেন আশ্চর্য হয়ে যায়, দেড় ভাগিতে মনে আধ মন সুদ দিতে হতো তোমাদের, টাকায় আট আনা। আমি কি চামার, মাসে আট আনা সুদ চাইব ? চলতি দরের হিসেবে টাকার খতে ধান নাও, দু আনা সুদ দেবে, টাকায় বা ধানে যা তোমাদের খুশি।

ধানে শোধ দিলে—? সংশয়ভরে প্রশ্ন করে এক জন।

ধানেই দিয়ো, নির্বিকার ভাবে বলে ধরণী, টাকায় দু আনা সুদ ধরে দর হিসেবে ধানেই দিয়ো।

এবার জ্বালা বোধ করে, সকলে। এতই বোকা ঠাউরেছে তাদের ধরণী তরফদার ? আজ ধানের দর কোথায় ফসল ওঠার আগে, ফসল উঠলে তা কোথায় নেমে যাবে। দু আনা সুদ !—বিনা সুদে এই কড়ারে ধান কর্জ না নিলে দেড় ভাগি হিসাবেরও অনেক গুণ বেশি ফিরিয়ে দিতে হবে ধরণীকে। ব্যাটা ধড়িবাজ ডাকাত !

ভূষণ বলে, আজকের চোরাবাজারি দরে মোরা ধান নিতে পারি কত্তা ?

তবে দেড় ভাগি হিসেবে নাও।

পুলিন জানা যেন হাঁফ ছাড়ে, ধরণীর চলতি দরের হিসাবে কর্জ দেবার প্রস্তাব শুনে তার মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

তাই দেন কত্তা, তাই দেন।

রও দাদা, রও। তড়ফিয়ো না অত।—তোরাব বলে ধমক দিয়ে, দেড়া ভাগির কর্জ মোরা ছোঁব না কেউ।

## ২

শীত পড়ছে অল্পে অল্পে। সকাল-সাঁঝে গায়ে কাঁটা দেয়, কাপড়ের খুঁট বা আঁচল বা গামছাখানি ভালো করে গায়ে জড়াবার তাগিদ আসে। রুক্ষ চামড়ায় খড়ি ওঠার সূচনা দেখা দিয়েছে সকলের, কারও

কারও খুব স্পষ্ট, গা চুলকোবার ফলে। চাষির চামড়ায় স্নেহ এক রকম না থাকার মধ্যেই চিরকাল, ক-বছর তাতেও বিষম ঘাটতি পড়ে চলেছে। স্নানের ঘাটে অল্পবয়সি মেয়ে-বউরা গা ঘষতে ঘষতে বলে অসন্তোষের সুরে, দুৎ, কী সুবুৎ হতেছে দিন দিন, মরে যাই। বেশি রাতে শীত পড়ে বেশি। সকাল-সাঁঝে বাতাস বয় না, কুয়াশা হয়, শীতের বাড় ঠেকে থাকে। সাঁঝের কুয়াশা হালকা, দূরের আলোও দেখা যায়, উজ্জ্বল বিন্দুর বদলে ঝাপসা আলোয় ঢাকার মতো। দু-একটা চোখে পড়ে এদিকে ওদিকে, আলো বেশি জ্বলে না গাঁয়ে। বোমার ভয়ের আইন নেই, কিন্তু তেলের অভাব।

দাওয়ায় একটা প্রদীপ জ্বালিয়েছে ভূষণ, এতগুলি লোকের আসরে একটু আলো ছাড়া চলে না। সরু সলতের ডগার ক্ষীণ মুমূর্ষু শিখাটি জ্বলছে, সতর্ক নজর রেখেছে ভূষণ, মাঝে মাঝে একটু উসকে দিচ্ছে সলতেটা। সে আলো যেন ছায়াপাত করেনি মাটির দেয়ালে চাটাইয়ে বসা জ্যান্ত মানুষগুলির, কোনো মতে শুধু চিনিয়ে দিতে পারছে চেনা মুখগুলি। অন্দরের আঁধার থেকে ভেসে আসছে মেয়েদের ছাড়া ছাড়া কথার আওয়াজ আর থেমে থেমে সুরবালার বিনিয়ে কাঁদার সুর। সেই বুঝি একা একটু শোক করছে ছেলের জন্য, ভূষণের বাড়িতে যদিও স্ত্রীলোক মোট পাঁচটি। সুরবালার তবে তীক্ষ্ণ গলাও ঝিমিয়ে মিইয়ে অস্ফুট হয়ে এসেছে ইতিমধ্যেই। পুত্রশোকও জোলো হয়ে গেছে মানুষের শোকে শোকে, এমনি তো বছর প্রায় ঘুরত না মড়াকান্না না কেঁদে, তার ওপর লাঠিগুলি বন্যা দুর্ভিক্ষ মহামারি যদি জোট বেঁধে এসে কাঁদাতে চায় অবিরাম, একটার বদলে এক সাথে দশটা মরণের ঘায়ে বুক ফাটিয়ে, কাঁহাতক শোক করতে পারে মানুষ। তা ছাড়া আছে যত কিছু সয় না তার সব সয়ে বাঁচা। পাথর নয় বলেই বুক ফাটেনি সত্যি কিন্তু তাই বলে পাথর হতে তো বারণ নেই বুকের।

মোহন গিয়েছিল একটু তামাক চাইতে প্রতিবেশী বটুকের কাছে। ফিরে এসে বলে, বটুক খুড়োর তামাক নেই।

এক ছিলুম নেই ? এক ছিলুম দিলে না ? হতাশায় রাগে গলা চড়ে যায় ভূষণের।

বললে তো কাল থেকে তামাক ফাঁক। তামাক টানতে টানতে বলল।

অ। ব্যাটা কঞ্জুস !

আর বললে কী শুনবে দাদা, উপোস পেটে তামুক খেলে বক্তবমি হয়, বলগে যা মোহন তোর ভাইকে ঠেসে গাঁজা টানুক, সিদ্ধি পাবে। হাসি কী, ঠিক ধ্যান শ্যালের গলায় কাশি ঠেকছে।

ওটা বেজম্মা, বজ্জাত। ছেলের বউটাকে ঘর ছাড়ালে।

ইন্দ্র ফুসলেছে না ?

ফুসলেছে, অমন ফুসলায়। কে কোথায় ফুসলায় আর ওমনি ঘর ছাড়ে ঘরের বউ না কি বটে ? কারও ঘরে মেয়ে-বউ রইত না তালি। খেতে দিত না তো কী করবে ঘর না ছেড়ে ?

তা ফের ভাতের ঘাটা নেই বটুকের।

তামুক ছাড়া জমে না।—আরেকবার আপশোশ করে ভূষণ। ছেলের মরণে সে যেন তেমন কাতর নয়, তামাকের জন্য আপশোশটা বেশি। বিশেষ কবে রাজেন দাস আজ যেচে এসে তার দাওয়ায় বসেছে বলে। মাননীয় ব্যক্তির পদার্পণে ধন্য হয়ে তাকে খাতির করার সাধ মেটানো গেল না বলে নয়, মানে তারা সমানই হবে, বয়সেও প্রায় সমান। সাপ-বেজির সম্পর্ক ছিল তাদের অনেক কাল। রাজেনের বোন সুখদা, ছেলেপিলে নিয়ে আজ সে সাত বছর ঘর করছে শিয়াপোলের অনন্তের, তাকে ভূষণ বিয়ে করেনি কথাবার্তা পাকা হবার পর, এই ছিল ঘটনা। ঘাটের পথে সাঁঝের বেলা একলা সুখদাকে নিমাই ছোঁড়ার সাথে কথা কইতে দেখেছিল, হেসে হাত নেড়ে কথা কইতে দেখেছিল ভূষণ নিজের চোখে—এই ছিল কারণ। সেও কথা কইতেই গিয়েছিল নিজে, দুটো মিষ্টি মিষ্টি প্রাণের কথা। কথা আর বলা হয়নি। খটকা একটা এমনিই ছিল ভূষণের মনে যে তার সাথে

লুকিয়ে ভাব করতে পারে যে মেয়েটা সে কি আর অন্যের সাথে পারে না ? এ ক্ষেত্রে অবশ্য ভাবটা হয়েছে তারই সাথে, কিন্তু কথা হল, স্বভাব ভালো যে মেয়ের সে তো এ রকম ভাবসাবের ব্যাপাব করে না কারও সাথেই ! যে খুঁতখুঁতানি মনে ছিল সেটা প্রত্যয় হল হেসে হেসে নিমাইয়ের সাথে হাত নেড়ে কথা বলা দেখে, বাঁশঝাড় গাছপালায় ঘেরা যে নির্জন স্থানটিতে শুধু তারই সাথে কথা বলার কথা সুখদার। বিয়ে তাই ভেঙে দিল ভূষণ, নিজে নিজে যেচে বরণ কবা যন্ত্রণায় দিশেহারা হয়ে রটিয়েও দিল মেয়েটার নামে মনগড়া কলঙ্ক। ঘটনা রটনা গালাগালি হাতাহাতি পুরানো হয়ে তলিয়ে গেল অতীতে, জিদ বজায় রইল মুখ দেখাদেখি বন্ধ রাখার, শত্রুতা করার। বিয়াল্লিশ সালে ব্যাপার হল একটা। বন্দুক উঁচিয়ে সৈন্য পুলিশ এসে অন্য ক-টা ঘরবাড়ির সাথে পুড়িয়ে দিল রাজেনের ঘরটা, আর এমনি মজার যোগাযোগ অদেষ্টের যে দু কোশ তফাতে কেঁদা গাঁয়ে ভূষণের মামা জগন্নাথের বাড়িতে সপরিবারে আশ্রয় নিযে দুটো রাত কাটাতে হল রাজেনকে সপরিবার ভূষণেব সাথেই। রাজেন ভেবেছিল, মামাকে বলে ভূষণ তাদের খেদিয়েই দেবে বেহদ্দ মারধোর খুন-জখম বলাৎকার ঘর পোড়ানোর তাণ্ডবের মধ্যে। তা শোধ নেবার কথাটা ভূষণও ভেবেছিল একবার, এত কালের শত্রুকে জব্দ করাব সুযোগ আর আসবে না জীবনে ! কিন্তু তাব পরিবর্তে দু-একটা কথা বলতে হয়েছে তাদের পরস্পরের সাথে। অবস্থা এমনই ছিল। সেই থেকে বিদ্বেষ ঘুচে গেছে তাদের, পথে-ঘাটে দেখা হলে দুটো একটা কথা তাবা কয়ে এসেছে পবস্পরে, কিন্তু শুধু ওই শত্রুতার অবসান ঘটা ছাড়া বোশ আর এগোয়নি তাদের সম্পর্ক। কেউ এতকাল পা দেয়নি কারও বাড়ি, ক্রিয়াকর্মে আপদে-বিপদে কেউ ডাকেনি অন্যকে। এত কাল পরে রাজেন আজ নিজে থেকে এসেছে তার বাড়ি। ওকে দু টান তামাক না টানতে দিতে পারলে কেমন লাগে মানুষেব ?

একবারটি ঝেড়েপুঁছে দেখে এসবে না কি রসিক ? ভূষণ আবেদন জানায়।

নেই তো জানি। বলছো যদি দেখে আসি।

তিনটে বিড়ি নিয়ে আসে রসিক। তারই একটা বাজনকে দেয ভূষণ, পিদিম থেকে ধরাতে গিযে নিবে যায় শিখাটুকু পিদিমের। ফের হাঙ্গামা করতে হয় পাথর ঠুকে সলুই জ্বালিয়ে আগুন সৃষ্টি করার। দু-একটান টেনে বিড়িটা রাজেন বাড়িয়ে দেয় তোরাব আলিকে।

আনমনা ছিল তোরাব। এনতার তাকে ডেকে বলে, বিড়ি ধবো মিয়া।

এ বড়ো আশ্চর্য কথা যে এতগুলি মানুষ তারা বসে আছে প্রায় চুপচাপ। কথার কামাই নেই বটে কিন্তু একসাথে কথা বলছে না একজনের বেশি, কথার আওয়াজে মোটে সরগরম নয় চোদ্দো জন চাষির আসব। কাটা-কাটা ছাড়া-ছাড়া সাধারণ চলতি আলাপ এটা-ওটা নিয়ে, তাই মন দিয়ে শুনছে সকলে যে যখন মুখ খুলছে। বিশেষ কিছু একটা শুনবাব জন্য যেন উগ্র প্রত্যাশা সকলের, কিন্তু বিশেষ কথাটা উঠছে না বলে আগ্রহ চেপে যেন অপেক্ষা কবার অসীম ধৈর্যও আছে সকলেরই। সবাব মনেব কথা কে আগে তুলবে, কী ভাবে তুলবে তাও জানা নেই কারও। বেশি উৎসুক এনতার, কেবলই উশখুশ করছে আর বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে চুলকিয়ে চলেছে ঘন বুক্ষ দাড়ি-ঢাকা চিবুক।

খাবা না তুমরা ? এসে শুধিয়ে যায় ভূষণের পিসি দয়া।

খাগা যা মোহন।

খাবো পরে।

একটা লণ্ঠন চলে যায় সামনের পথ দিয়ে, ঝকঝকে নতুন লণ্ঠন, সযত্নে কাটা পলতের উজ্জ্বল তেজি শিখা। কনস্টেবল শশী পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে দারোগা মৃণালবাবুকে। হঠাৎ তীক্ষ্ণ আর্ত কেউ কেউ চিৎকারে বাতাস চিরতে চিরতে পথ ছেড়ে ছুটে পালায় রসিকের বাড়ির কুকুরটা। কে জানে দারোগাবাবুর চলার রাস্তায় পুঁটি কী খুঁজছিল বাড়িতে চালার কোণে তার এক গন্ডা বাচ্চা ফেলে রেখে।

বলি কী, রাজেন দাস বলে, উপায় একটা না হলি তো নয়। সব দিকে দেখি মরার জোগাড়।

অ্যাদ্দিনে জানলে সেটা ! তিনু বলে খোঁচা দিয়ে।

আঃ হাঃ ! বড়োই বিরক্ত হয় তোরাব, ছেঁদো কথা রাখো না এখন, ঘরে গিয়ে চাটনি খেয়ো।

বলি কী, রাজেন দাস বলে, একটা উপায় চাই। এত নিরুপায় জন্মে হইনি কোনোকালে। অজন্মা এল তো বুঝি, না তো এও বুঝি শালা একদম মন্বন্তর ঘটেছে, ও সব যা করেন তা ভগবান করেন, তেনার নিলা-খেলা আর মোদের অদেষ্ট। কিন্তু ই কী রে বাবা, অজন্মা না, দুর্ভিক্ষ না, খাসা ফলন, তবু হাঁড়ি চড়বে না, ছেলেপিলে খিদেয় কাঁদবে ?

শুধু কাঁদে না কি ? তিনু বলে, মরে না ?

শ্রীনাথ বলে, বিন্দাবনের বড়ো ছেলেটা মরেছে, ছোটোটা মরবে। ওই যে মণিবাবু, জ্ঞানবাবুর ভাগনে, তেনা ছুটে শুধোতে এল—

আঃ হাঃ ! তোরাব বিরক্ত হয়ে বলে।

কিন্তু এবার তার বিরক্তি ও আপত্তি খণ্ডন করে রাজেন বলে, না না, শুনি ব্যাপার।

শ্রীনাথ বলে যায়, কলকাতায় কাগজে লিখবে কি না যে না খেয়ে মরেছে, তাই শুধোতে এল জ্ঞানবাবুর ভাগনে, মোদের ওই মণিবাবু। তা ইদিকে মিনালবাবু শাসিয়ে গেছে, উপোসে মরছে তা বলতে পাবে না, বলবে যদি তো মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবে, কয়েদ করবে। বিন্দাবন কী করে, মণি বাবুকে বলল, না বাবু, না খেয়ে মরেনি ছেলে, ব্যারামে মরেছে। তা, ব্যারামটা কী হয়েছিল ? তা কী বুঝি বাবু, চাষাভুসো মানুষ ও, কী জানি কী পেটের ব্যারাম। তোমার ভয় নেই বিন্দাবন, যে যেথা আছে তোমার ছেলের মৃত্যুর শোধ নেবে। না, ব্যারামে মরেছে ছেলেটা বাবু। ব্যারামেই মরেছে।

গলা খাঁকারি দিয়ে থুতু ফেলে শ্রীনাথ কথার শেষে।

রাখাল বলে আস্তে আস্তে, মণিবাবু এক পসারি চাল দেছে বিন্দাবনকে। আব দুটো কমলা দেছে বিন্দাবনকে ছেলেটার তরে। বলল কী, মামা কত খায়, এট্টু এট্টু রস করে ছেলেটাকে দিয়ো বিন্দাবন। মণিবাবু এমনি কমলা দিয়ে এমনি করে বলতে বিন্দাবন কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। স্বীকার করলে না বাবু, ছেলেটা ব্যারামে মরেনি, না খেয়ে মরেছে। কলকাতার কাগজে বেবুবে খপর।

বলি কী, রাজেন বলে, খানিকক্ষণ নিজে আর অন্য সকলে চুপ করে থাকার পর, কী কবা যায়। আর তো সয় না। মোদের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে না কি শালার ব্যাটা শালা ধরণী শালা ? ই কি রে বাবা, গাঁ পিতিবেশি চাইলে মানুষ ধান দেয় যে হাঁ আজ বাদে কাল ফিরিয়ে দেবে ! মোরা তোর গাঁয়ের মানুষ, একটা মাসের তরে দুটো ধান দিবি, কর্জ দিবি, তাতেও তোর দেড়ভাগি চাই ? বলি, মাগ যে তোর বছর-বিয়ানি, দু-তিনমাস ছুঁতে পাস না ফি-বছর, তা ভাত-কাপড় কি বন্ধ বাখিস মাগের ? না, কুব্জা জেলেনির পিছে যা খরচ করিস তার সুদ কষিস ?

খিলখিল করে হেসে উঠে অপ্রস্তুত হয়ে থমকে থেমে যায় অল্পবয়সি জোয়ান মোহন। ভূষণ মুখ ভার করে তাকায়। যেন পিদিমের মৃদু আলোয় ভাইটা তার মুখের ভাব দেখতে পাবে। অন্যেরা বিরক্ত হয় না, তবে বুঝেও উঠতে পারে না এমন কী রসিকতা আছে। গুরুতর কথাগুলির মধ্যে রাজেনের যে হাসি সামলাতে পারল না মোহন। রাজেন স্পষ্ট করে জমাট করে প্রকাশ করেছে সবার মনের এলোমেলো অশান্ত খেদ। এ তো সত্যি কথাই যে ধরণী যেন রাজা-বাদশা, ঘরের বউ পরের মেয়েছেলেকে খুশিমতো ভোগ করবে, টাকা নাড়াচাড়া করবে যেন পয়সা হাতের ময়লা মাত্র, নতুন ফসল ওঠার আগেও ধান ভরা থাকবে পাঁচটা খামারের দুটোতে আর হেথা-হোথা ছড়ানো—এদিকে নিজের নিজের একটি পরিবারকে তারা যে ছোঁবে সে সামর্থ্য কই, ছোঁয়াছুঁয়ি সইবার শক্তি কই সে বেচারার, গর্ভবতী বউগুলির কথা তো আলাদাই, তারা বাঁচে কি না বাঁচে নিত্য এ ভয় ভরামাস হবার আগেই। টাকা আর ধান শুধু তাদের ঋণের খত। জমি যার আছে দু বিঘে তারও, এক মুঠো মাটিতে যার স্বত্ব নেই তারও। ঠিক কথাই তো বলেছে রাজেন !

খাবা না ? এসে শুধিয়ে যায় ভূষণের বিধবা পিসি দয়াব বিধবা মেয়ে হারাণি।

দুত্তোর নিকুচি করেছে তোর খাওয়ার, রেগে তেড়ে-মেড়ে ওঠে ভূষণ, দিবি তো দুধ পোয়া মাপে আলুনি ফ্যান-ভাত, ডাকের কামাই নেই, লুচি-পোলাউ ভোজ খেতে ডাকছে যেন হারামজাদি।

ভোঁ করে কেঁদে ওঠে হারাণি কলের দড়ি-টানা বাঁশির মতো, যুবতি মেয়ের মনটা যেন চড় খেয়ে কেঁদে-ওঠা শিশুই আছে এখনও, আর নাক দিয়েও তার সিকনি নামে সেই ছেলেবেলার মতো, নাক টেনে টেনেও সামলাতে পারে না। মরণ ঠেকাবার উপায় খোঁজার জন্য জড়ো এই চাষির আসরে যেন ছেঁড়াতালি কাপাসে আধঢাকা রোগা রুগ্‌ণা মূর্তিমতী বিঘ্ন। পুরাণে নজির আছে, পিনাক সামন্ত, ভাবে খুশি হয়ে, অর্জুনের তপস্যা ভাঙতে এমনি ভাবে এয়েছিল উর্বশী—মেয়েগুলো মরে না, এই যুবতি মেয়েগুলো ?

আমি ডেকেছি ? মা বলল না ডাকতে ? নিজে যদি এসে ডেকে থাকি তো—নাকের জল চোখের জল খেতে খেতে কথা বলতে গিয়ে বিষম লাগে হারাণির। আচমকা অন্দরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ঠাস করে গালে তাব একটা চড় বসিয়ে দয়া তাকে ভেতবে টেনে নিয়ে যায়।

লম্বা নিশ্বাস ফেলে ভূষণ বলে, শহরে ছিল বছর দেড়েক দুযেক। দুর্ভিক্ষের ফলে পুষতে পারিনি, মোর যে দাদা দুকান করে শহবে, তার ঠেয়ে পাঠিয়েছিনু মরতে। এমনি দশা হযে ফেরত এযেছে মেয়ে। কী নাকি ব্যারাম হযেছিল— শহুবে ব্যারাম।

কি দুকান করে হে নয়ন শহরে ? একজন শুধায।

চুপ করে থাকে ভূষণ।

শুনি তো কত কাল নয়ন না কি দুকান করে, তা দুকানটা কীসের ?

কী জানি কীসের দুকান। এবাব বেগে বলে ভূষণ।

আঃ হাঃ, তোবাব বলে জোর দিয়ে, দুকানেব কথা যাক। ধবণীর দুটো খামারের ধানের কথা বলাবলি, উয়ার মদ্যি দুকান ! কী দুকান, কীসেব দুকান। কাজের কথা কও। সাতনালার খামারে লোকজন বেশি রয় না।

শুনে সবাই আবাব ধাতস্থ হয়ে গুম খায। ধরণীর একটা খামার আছে সাতনালায়। ধান বোঝাই খামার। তা সে খামার তো আগেও ছিল, এখনও আছে, কী তাতে। সবাই জানে আজ এই মরিয়া বেপরোয়া মানুষগুলির আসরে ধরণীর ওই ধান বোঝাই খামারের কথা ওঠার মানে কী, খামারে লোকজন বেশি থাকে না এ কথা বলারও মানে কী। তবে কি না, যার যাব মনে মনে বোঝা কথাও সবার মিলেমিশে একসাথে একভাবে বোঝা তো দরকার।

তা বটে, রাজেন বলে, উয়ার খামাব-ভরা ধান, মোদের দুর্দশা।

ধানে উয়ার স্বত্ব কী ?

লুঠের ধান না ?

আসলে মোদেরই ধান তো, না কি বলো ?

গায়ের জোরে কেড়ে নেছে বই ত না ?

এ তো একই কথা, ঘুরিয়ে বলা। এত দূর এগিয়েও পরের কথাটা জিবের ডগায় এসে আটকে আছে অনেকের। ধীর, অতি ধীর জীবন এদের—অকালে বুড়িয়ে ঝরে যায়, তবু ধীর। ঘুম ভাঙে হাই তোলে, আড়মোড়া ভাঙে, সন্দ করে যে সত্যি রাত শেষ না চাঁদের আলোর আভা বাইরে—না, ভোরই হচ্ছে, কাকের ডাক শোনা যায়। মাঠে গিয়ে লাঙলের ফলা মাটিতে ডারায়, ফসলের আশা তার কাল নয়, পরশু নয়, মাসকাবারে নয়, সেই ফসল ফলাবার পর। ধৈর্য ছাড়া তার কি চলে, ধীর না হয়ে উপায় আছে ?

শেষে মোহন বলে, ধান যদি মোদের, কেড়ে নিতে, লুঠে নিতে পারি না মোরা ? না, ওটা ধরণীদের একচেটে কারবার ?

বলি কী, রাজেন তখন বলে, কথাটা বিবেচনা করি এসো মোরা। লুটে আনতে চাও যদি তো চলো যাই আজ রাতেই হানা দি সাতনালার খামারে। তবে কি না হাঙ্গামা হবে তা বলে রাখি, বিষম হাঙ্গামা হবে। তখন দুষো না মোকে।

সেই যেন এতক্ষণ ধরণীর সাতনালার ধানের খামার লুঠ করার প্ররোচনা দিচ্ছিল সকলকে, পরামর্শটা গ্রাহ্য হওয়ায় সাফাই গেয়ে রাখছে হুঁশিয়ারির। ঘরে কাটা চরকার সুতোয় মদন তাঁতিকে দিয়ে বোনানো খদ্দরের কাপড় আর কামিজ গায়ে সতেরো দিন হাজত খেটেছিল রাজেন। বিয়াল্লিশে ঘোষণা করেছিল, গান্ধীজি স্বপ্নে দর্শন দিয়ে তাকে আদেশ দিয়েছেন যে, স্বরাজ এসে গিয়েছে। আর ভয় নেই।

এনতার খুশি হয়ে বলে, হাঙ্গামার কমতি কোথা ? হাঙ্গামা ছাড়া কদিন কাটে ? ঘর তো করি হাঙ্গামা নিয়ে। রামপুরে মোর চাচা থাকে এ গোস্তাকির মাপ নেই, পরশু রোজ তাই হানা দেয়নি মোর ঘরে ? হাঙ্গামার কথা বলো না দাদা, ওটা খোদার নজরানা।

কী আর হবে হাঙ্গামায় ?

কচু করবে মোদের, যা করার করেছে।

মারবে তো ? মারুক। মরেই আছি।

হাঃ, মরে আছি। কেন বাবা মরে রইবো ? খালি খালি মরে রইবো ? মারতে জানি না দুঘা দিয়ে।

বলি কী, রাজেন বড়ো গম্ভীর, গলার আওয়াজ গমগমে, চলো তবে আজ রাতেই যাই। কথা তবে শুনে রাখো কিন্তু, লুঠবো গিয়ে একসাথে, তার পর যা ঘটবে সবই মোরা একসাথে তার দায়িক। ধান নিয়ে চটপট সরে পড়বে। ঘরে রাখবে না ধান।

কোথা রাখব ? একজন শুধায়।

তাও জানো না ? রাজেন বলে হতাশায় অবজ্ঞায়, ধান ফেলে রাখবে বন-বাদাড়ে, ডোবার ধারে। খানিক বরবাদ যাবেই, উপায় কী !

# বক্তা

ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায় আকাশে। জোরালো শব্দ তুলে ঠিক যেন তেড়েমেড়ে এসেছিল এক পশলা বিষ্টি, দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। আকাশ জুড়ে শুধু আছে গর্জন আর আলোর চমক।

ঘুঁটেগুলি ঘরে তুলতে সাহায্য করেনি তাই কাসা গর্জে গর্জে গাল দিয়ে যায় একটানা আকাশে জলহীন ভাঙা ভাঙা ভাসা ভাসা মেঘের গজরানির মতো। একটানা অফুরন্ত। দোংড়া হাসি মুখে দাদ চুলকায় বসে। কথা বলাই তার নেশা আর পেশা। কিন্তু বউ গজরাতে শুরু করলে সে চুপ মেরে যায়, তার এই বস্তির পৃথিবী যেন তাকে রাজা করেছে সে বোবা বলে ! শুধু দাদ চুলকোয়। দু হাতের আঙুলগুলি দ্রুতবেগে সঞ্চালিত হয় পিঠ থেকে পেটে, পেট থেকে উরুতে, উরু থেকে পায়ের গোছায় পাছায় ঘাড়ে, পায়ের আঙুলের চিপায়। পায়ের আঙুলের চিপায় দাদ নেই, অন্য চুলকানি।

সুব্বা বোতল নিয়ে এলে সে এতক্ষণ পরে ঝকঝকে দাঁতগুলি বার করে ঠোঁট ফাঁক করে একরাশি খুশির হাসিতে। বোতলটা আয়ত্ত করে বেড়া ঘেঁষে শুইয়ে রেখে কাঁচা বদগন্ধি চামড়াটা চাপা দিয়ে আড়াল করে বলে, শালিকে চুপ করা দিকি, মরদ বুঝব।

মারব টেনে এক—? সুব্বা শুধায় নেশার ঝোঁকে। আজ তার ভীষণ পরীক্ষার রাত্রি। বোতল এনেছে, ভোগও এনেছে, তবু টেনে এসেছে নিজে নিজে।

গেঁড়িকে চিরকালের জন্য বশ করার কায়দা-কানুন দাওয়াই সালাই বাতলে দেবে দোংড়া, বাঘিনির সঙ্গে সাত বছর বসবাস ঘর সংসার করেছিল যে সিংজতকা তার একটু করে হাড়ও তাকে দেবে।

মারলে হাঙ্গামা হবে।

বেশ তো। আচ্ছা তো ঠিক করে দিব।

কাঁচা বয়সের জোয়ান, গোঁ কত। হাসি আসে দোংড়ার পিছুপিছু গিয়ে সে বেড়ার ফাঁকে চোখকান পেতে দ্যাখে শোনে কাসাকে ঠান্ডা করার তার ছেলেমানুষি কায়দা কতটা সফল হয়। গোড়ায় তেজ কত সুব্বার জোর কত !

অত গোসা কেনে গো মাসি !

মরনা কেনে ? মর গা যা।

রয়ে সয়ে মাসি, যা বলতে আলাম শোন আগে, তারপর নয় কেমড়ে দিযো। তবে কিনা হাঁ, গোসা করলে খাসা দেখায় বটে তুমায় মাসি, মন করে কী তুমায় বাগিয়ে নিয়ে বনে পালাই।

হাঁ বটে ? তা বনে পালিয়ে কাজ কী ! নে না মোকে, এখনি নে না বাগিয়ে।

মস্ত জোয়ান চেহারা কাসার, দু হাতে সাপটে নিয়ে সে পিষে চেপে ধরে সুব্বাকে, হাঁসফাঁস করে ওঠে সুব্বারও প্রাণ পাঁজরা দুই-ই।

মাল টেনেছে ছোঁড়া ! কাসা বলে মুখ বাঁকিয়ে। রাগত মাসির বাড়তি জোর কিন্তু যেন খানিকটা ঢিল হয়ে আসে তার হাতে, বুকে পিষে চ্যাপটা করে দেবার মতো জোরে সে আর চেপে ধরে রাখে না কাঁচায় পাকা রোগা ছোঁড়াটাকে।

মোকে কী বলবি যে ?

মাল এনেছি। একটো মুরগি !

হাত দুটো গলায় জড়াতে গেলে কাসা একটু অবাক হয়ে মুচকে হেসে ঠেলে তাকে সরিয়ে দেয় তিন হাত পিছনে।

গেঁড়িকে বাগাতে মাল এনাছে মুর্গি এনাছে, মোর সাথে পিরিত করতে চায়। যা, মরগা যা গেঁড়ির কাছে।

বলে সে খলখল করে হাসে।

দোংড়া গা চুলকায় আর হাসে, বলে, দেখলি ?

কেনে, চুপ মারাইনি উয়াকে ?

তা নয়। গায় জোর দেখলি হাতির মতো ? বিড়ি ধরানো বন্ধ রেখে খ্যা খ্যা করে দোংড়া হাসে শেয়ালের আওয়াজে।

সুব্বা তাকায় সন্দিগ্ধ চোখে, তার ভয় হয়, অবাক লাগে।

তু জানলি কিবা ?

চোখ মুদে দেখলাম। দোংড়া বলে অবজ্ঞার সুরে। চোখ মুদে ভুঁয়ে এমনি লাগাবো আঙুল, গায়ের গন্ধ যার জানি সে যেথা থাক ভুঁয়ে দেড়িয়ে, নজরে এসবে। আব জলে যদি রয় তো জল ছোব চোখ মুদে, সমুদ্দুরে ডুবে থাক নজরে এসবে।

চোখ পিটপিট করে দোংড়া যেন দ্রুত মন্ত্রতন্ত্র আউড়ে যাচ্ছে চোখের পাতা নেড়ে।—সাপে কাটল গুরুকে। আগে হুকুম দিল গুরু, নয় তো তাকে কাটবে এমন সাপ কুথা আছে জগতে ? বাঁচা দোংড়া, কালসাপে কেটেছে, গুরু বললে মোকে। মোকে যাচাই করবে আর কী, না তো দশ-বিশটা কালসাপে কাটলে কী হবে তার, বিষ বেরিয়ে যাবে ঘামে। কালসাপ কাটলে যেমন যেমনটি করন আর যেমন যেমনটি না করন সব করলাম আর না করলাম ঠিক ঠিক, একটুকু খুঁত হল নাই, ভুলচুক। গুরু বললে মোকে বাঁচালি দোংড়া, বড়ো বিদ্যা দিব তোকে। এই বিদ্যাটা শিখাই দিলে। মাটিতে আঙুল ছুঁয়ে দূরের মানুষ নজরে আনা।

বিড়িটা ধরিয়ে উদাসভাবে দোংরা টান দেয়, ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়ে।

যা যা বলেছিলাম ঠিক ঠিক কর‍্যাছিস ?

হাঁ। ভুলচুক নাই।

গেঁড়ির চুল এনাছিস তিনগাছ, মাড়ানো মাটি ? ষাঁড়ের লোম ? আর সেই সেটা ?

দোংড়া শুধিয়ে যায়, সায় দিয়ে যায় সুব্বা।

সেটা দিলে কে ?

গাবার বউ। গিয়ে চাইতে না এই মারে তো সেই মারে, ওস্তাদের শাপ লাগবে ভয় দেখাতে রাজি হল।

গাবার বউ। চিন্তিত মুখে বলে, দোংড়া, গাবার বউ ? ছেলা হইছে একটা। আর কারুকে পেলি না, ছেলা পিলা হয়নি ?

আঁ ? সুব্বা আঁতকে ওঠে, সামান্য ভুলের জন্য এত হাঙ্গামা এত পয়সা খরচ সব ভেস্তে যাবে !—তু কেন বললি না উ কথা ?

দোংড়া ভরসা দিয়ে বলে, ঠিক আছে। হবে খন যা। একটুখানি কমজোরি হতে পারে তুকটা, তা কাজ চল্যা যাবে উয়াতে। পরের ঘরের মেয়া বউ হলে ভাবনা ছিল। নিজের বউ তো, ঢের হবে উয়াতে, ঢের। পা চাটবে বশ হয়ে।

কাসা ইদিক-সিদিক কথা কয় না, সোজা দাবি জানায়, বোতল কই ? বোতল দে।

শুদ্ধাই হয়নি যে ? দোংড়া বলে ভয়ে ভয়ে।

শুদ্ধাই কর ? আটক কীসের শুনি তা ? মতলব জানি তুমাদের। ইদিকে ঘুমাব, দিন ভোর খেটেছি ঘরে বাইরে, ভোঁস ভোঁস ঘুমাব, বোতলটি খুলে তুমরা সাবাড় করবে দুজনায়। কী শুদ্ধাই, মোর সামনে করো।

সুব্বাও জানে কাসার ঘুমোবার অপেক্ষায় আছে দোংড়া। বাইরে খেটে পয়সা কামায় কাসা পেটের জন্য, দোংড়া যা ভরণ-পোষণ জোগায় তাতে তার পেট ভরে না। এত খাটে কাসা যে রাত জাগতে পারে না, মড়ার মতো ঘুমোয় রাত বেশি বাড়বার আগেই বিছানা নিয়ে। কাসা ঘুমানো পর্যন্ত দেরি না করে সুবিধা নেই। তার জাগন্তে বোতল খুললে একা সে আদ্ধেকটা গিলবে।

প্যাঁচার ডাক না শোনাতক—

শুনেছি ডাক। ওদিকে ডেকেছে, জামগাছটায়। শুদ্ধাই কর, এসতেছি।

শুদ্ধাই-এর প্রক্রিয়া শুরু করতে করতে দোংড়া খ্যা খ্যা করে হাসে। বলে, দেখছি ? ও মাগি মোষের মতো গুঁতোয় ! হাড়পাঁজরা ভাঙে নাই তো তোর দুটো একা ?

কুথা এত জোর পায ভাবি।

খায় যে, গা চুলকে চুলকে বলে দোংড়া বলার মতো কথা পেয়ে, মোর চেয়ে দুগুণা তিনগুণা খায়, ভালা ভালা জিনিস আনে, একলাটি খায। খাও তো সব না খাও তো কিছু নাই। গুরু গুণ দেছে তাই, না তো উয়াকে বশে রাখতে পারতাম মুই ? যদি না গুনিন হতাম, মানুষ হতাম তোর মতো ? হাঁ হাঁ বাবারাম, গুনিন না হলে মোকে চুষে লিত দশ দিনে, ছাবড়িয়ে দিত, মেরে দিত একদম। গুনিন বাদে খাওয়া সব, উ ছাড়া কিছু নাই।

হাতের দশটা আঙুল সারা গায়ে চুলবুল চুলকে বেড়ায়। বক্তৃতা যত জোরালো হয়, তার চুলকানি তত বাড়ে।

পেট ভরে মাছ দুধ খেলে তোর তেজ কত, জুৎজুয়ানি কত, কাজে তেজ, বজ্জাতিতে তেজ। দুটো দিন উপোস দে, ভালা কাজে ঝিমঝিমোবি, বদ কাজে ঝিমঝিমোবি, কুথাও গা নাই, সাড় নাই। শালা বোকা বুঝিস না সিধা কথা ? দুটা দিন উপাস করে বলিস দিকি গেঁড়িকে একবারটি কাছে এসো—গেঁড়ি এসবে, হেঁসে হেঁসে টিটকিরি দেবে রাত ভোর ! হাসবার চেষ্টা করতে গিয়ে এবার অদ্ভুত একটা আওয়াজ বার হয় দোংড়ার মুখ থেকে। শুদ্ধাই-এর প্রক্রিয়া চটপট সাববার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। সবটা না করলেও অবশ্য চলে। সুব্বা টেরও পাবে না কি প্রক্রিয়া বাদ পড়ল কিন্তু দোংড়া নিজেই যে পারে না যা এসেছে করে বরাবর, করতে করতে পুরুত ঠাকুরদের পুজো আচ্চার মতো যা তার অভ্যাসে আর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে তা কেটে ছেঁটে ছোটো করতে ! তাতে দোষ হবে। রাগ করবে আঁধারের জীবরা। সুব্বার মতো যারা আসে তার কাছে তাদের মনে খটকা লাগবে তার অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে।

কথা সে বলে যায় সমানে।—গুনিন বাদে আর সবার খাওয়াই সব। আরে শালা, কেষ্ট ঠাকুর যে দশ-বিশ হাজার গয়লা মেয়েকে মজুত রাখত রাধা সুদ্ধু, সে শুধু ক্ষীর ননী সর খেত বলে, ঘরে খেত, ফের পরের ঘরে চুরি করে খেত, তবে না ! খেতে যদি পেতিস জুত করে তো কি এসতিস মোর কাছে এ তুকের জন্যে, এমনিতে গেঁড়ি তোর বশ থাকত, পা চাটত দু বেলা !

ক্রিয়াকর্ম শেষ হবার আগেই কাসা এসে পড়ে চুপচাপ একপাশে বসে থাকে, কথা কয় না, বাধা দেয় না। সময় মতো জ্বলন্ত অঙ্গারটাও সে দোংড়াকে জুগিয়ে দেয় বরাবর যেমন কৌশলে দিয়েছে তেমনিভাবে।

সিংহীকে বশ করে যে মহাপুরুষ অনেক বছর সিংহীর সঙ্গে বসবাস করেছিল তার হাড়ের টুকরোটি হাত পেতে নিতেই জ্বলে পুড়ে যায় হাতের তালু সুব্বার !

ফেলে দিলি ! ফেলে দিলি ! আর্তনাদ করে ওঠে দোংড়া।

বিড়বিড় করে বলে, তেজ ফারাক হয়ে গেল, ভাগ হয়ে গেল। শালা তু কেমন মদ্দ ? থাম্ বোস চোখ বুঁজে। কুড়িয়ে আনি, তেজ খানিক দি তোকে।

হাড়ের টুকরোটি কুড়িয়ে এনে সে সুব্বার হাতে দেয়। জ্বলন্ত অঙ্গারটি পিষে গুঁড়ো হয়ে নিভে গিয়ে মিশে গেছে উঠোনের মাটির সঙ্গে।

হল না কি ? কাসা শুধোয়।

হাঁ। সব ঠিক আছে। এ শালা মাটি করলে সব। শালা হাতে পেয়ে—

বক্‌বক্ ! বক্‌বক্ ! সিংহীর মতো গর্জে উঠে কাসা, চুপ যা। সিলাই কর ঠোঁট। আর যদি কথা বলবি তো তোর মুখটা মোর চট সিলায়ের ছুঁচ দিয়ে সিলিয়ে দিব। খোল বোতল !

এক-আধবোতল নিজের গলায় ঢালে না কাসা, মাল সে নেয় খুব কম। আশ্চর্য হয়ে সুব্বা দ্যাখে কী, দোংড়াকেই সে খাওয়াচ্ছে বেশি বেশি করে। তাকে পর্যন্ত কম দিচ্ছে। একবার সে প্রতিবাদ জানাতে যায়। কাসা হাত বাড়িয়ে গালটা তার টিপে দেয় জোরে। ব্যথায় কাতরে উঠেই নেশায় সামলে নিয়ে সে চোখ ঠারে কাসাকে।

এ ন্যাকামিতে গোসা করে কাসা বলে, মর না কেনে ? যা মরগা যা।

তখনও আলোয় চমকে চমকে আওয়াজে গর্জে গর্জে বিদ্যুৎ খেলছে আকাশে।

দেবরাজ ইন্দর ব্যাটা, দোংড়া বলে যায় জড়িয়ে জড়িয়ে, এমনি কাণ্ড করে অখন তখন খেয়াল হলি পর, মানুষটা খেয়ালি ভারী, উঁহু, মানুষ না মানুষ না, দেব্‌তা দেবরাজ, কথাটা কী যে তেনা মান্‌ষের মতো খেয়ালি, হাওয়া গাড়ির রেতের বাবু। তাই কয়ে কী, দু ফোঁটা বিষ্টি দিয়ে বলে, বাস্। বজ্‌জর নিয়ে লুটোপুটি খেলা করে আকাশে। বেম্মার বারণ আছে, হাত ফসকে বজ্‌জর যদি ভুঁয়ে পড়ে তো পেলয়ের আগেই দফা শেষ পিথিমির। তা মানা কী মানে সে না মানতে পাবে, রাজা, সে দেবতার রাজা, মানা করলে খেপে বলে কী যে দুত্তোরি তোর মানার নিকুচি করেছে, চালাও হাওয়া গাড়ি চালাও, জোরসে ! ওর স্বভাব এমনি তো কী করবে ও বেচারা ! চিরকালডা এমনি ও শালা, জুয়ান বয়স থেকে। শিখতে গেছে ওস্তাদের কাছে, সে মস্ত ওস্তাদ, গোতম ওস্তাদের নাম নিয়ে চান করলে রাজার রানির গভভো হত। ধম্মো মানা করলে, গোতমের বউটা বড়ো ইয়ে মতো, তড়বড়াতে যাসনি ইন্দর তার সাথে। দরকার কি ছিল বাপু তোর গায়ে পড়ে মানা করার ? তুই ধম্মো, তুই কি জানিস না ইন্দর মানা মানে না, যা মানা ঠিক তাই করে, না তো সে রাজা কীসের, দেবতার রাজা ? গোতমের বউটা তড়বড়ায়, নামটা কী যেন ছিল তার, আউলা সতী ? হাঁ, আউলা সতী, তা, আউলা সতী তড়বড়াক, ধম্মো মানা যদি না করতো তো ইন্দর শুধু শিস-টিস দিত, চোখ চেয়ে বলত হুররে, জয়হিন্দ, এক পাত্তর সুধা টেনে আউলার চুলে এক থাবড়া বসিয়ে গোতম ওস্তাদের কাছে যেত বিদ্যে শিখতে। বুড়ো বেতোরুগি, শুধু মানা করে করে ধম্মো বজায় রেখেছে চিরটাকাল, সবাইকে শুধু মানা করা তার কাজ। সে কেন পারবে দেবরাজ ইন্দরকে মানা না করে ? আউলা তড়বড়ায়, ইন্দর ভাবে, ধম্মো মানা করেছে। ভাবে, মানা করেছে ? মোকে মানা করেছে ? দুত্তেরি ধম্মো, দুত্তেরি মানা ! আউলা তড়বড়ায়, সেও গিয়ে তড়বড়ায় তার সাথে। ওস্তাদি শেখে না কিছু। শিখলে কি এমন ফ্যাসাদে পড়ে দৈত্য মারা নিয়ে, অস্থি মুনির পা ধরে কেঁদে বজ্‌জর আনতে হয় ? আউলার সাথে তড়বড়াতে তড়বড়াতে ইন্দর দ্যাখে কী, হায় সর্বনাশ, গর্মি হয়ে ঘা হয়েছে সারা গায়ে। ধম্মো কেন মানা করেছিল তা টের পেয়ে হাপুস চোখে কাঁদে ইন্দর। শুধু কাঁদে আর কাঁদে। এত কাঁদে যে তার চোখের জল বিষ্টি হয়ে পড়ে পিথিমিতে। বিষ্টি হতে ঢাষিরা জমি চষে চাষ শুরু করে দেয়, ভাবে ফসল যদি—কাশতে হওয়ায় একটু থামতে হয় দোংড়াকে।

খা না কেন ? কাসা তার মুখে তুলে ধরে মাল ভরা ভাঁড়টা।

আকাশে শুধু চমক আর গর্জন। পূর্ণিমা কদিন পরে, চাঁদ গেছে আড়ালে তার পাত্তা নেই। দূরে ওই সড়ক বেয়ে চলেছে দুটো দুটো জ্বলজ্বল চোখ মেলে ধবধবে সাদা আলো ছড়িয়ে ছড়িয়ে চাকাওলা কলের গাড়ি।

দেখছিস ? দু ফোঁটা বিষ্টি দিয়ে এমনি খেলা করে ইন্দর, ব্যাটা দেবতার রাজা। দে না বেটাচ্ছেলে, জল দে না আরও দু ফোঁটা, মাঠে ধান হোক ? লাখ গণ্ডা লোক যে শালা মরে গেল না খেয়ে ? না ! না !—বীভৎস আর্তনাদ করে ওঠে দোংড়া ! সুব্বা চমকে ওঠে, কাসা আরও কাছে ঘেঁষে যায় দোংড়ার। সুব্বাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, ঠিক আছে। ইবারে ঘুমাবে।

কাসা আরেক ভাঁড় তুলে ধরে দোংড়ার মুখে। তৃষাতুরের জল খাওয়ার মতো দোংড়া সেটা শুষে শুষে নেয়। কাসার কাঁধে একটা হাত রেখে আবার বকতে শুরু করে। এবার সে কথা বলে আস্তে আস্তে জড়িয়ে জড়িয়ে, চোখ বুজে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে।

ইন্দরটা এমনি। পরান নিয়ে খেলার শখ। দে না বাবা দু ফোঁটা জল, চাষ করি ? না ! না ! এবার আর্তনাদ ফোটে না দোংড়ার গলায়, সর্বাঙ্গে ঝাঁকি দিয়ে আঁতকে উঠে সে মৃদু ফোঁসফোঁসানির মতো বলে যায়, না না, বিষ্টি চেয়ো না ও ঘেয়ো রাজার ঠেয়ে। দু ফোঁটা বিষ্টি চাইলে ও লুচ্চা বন্যা দেবে। সব ভেসে যাবে। ঘর দোর খামার ভেসে যাবে। মাইরি বলছি কাসা—

কাসার বুকে মাথা রেখে গুটানো পা দুটো এবার সামনে মেলে দিয়ে দোংড়া একটা মস্ত হাই তোলে, চোয়াল ভাঙা হাই। সে ঘুমিয়ে গেছে। ঘুমিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত সে কথা কয়, অনর্গল কথা কয়। ঘুমোলে এমনি একটা হাই তোলে।

কাসা হেসে বলে, রাত ভোর ঘুমাবে। বজ্জর পড়লে জাগবে নাই। আর।

# ঘর ও ঘরামি

সারারাত বৃষ্টি পড়িয়াছে, কখনও টিপিটিপি, কখনও ঝমঝম। ভোরে দেখা গেল আকাশে মেঘের চিহ্ন নাই। অন্যদিন রোদ উঠিলে পৃথিবীকে কেমন দেখায় আজ যেন মনে পড়িতে চায় না ; আজ চারিদিকে হাসির ছড়াছড়ি। সমতল মাটির উপর যা কিছু মাথা উঁচু করিয়া আছে, ঝোপঝাড় আর বড়ো বড়ো গাছ, লাউ কুমড়ার মাচা আর শন ও খড়ের ঘর, সব কিছুর গায়ে ঝরিঝরি অবস্থায় অসংখ্য জলবিন্দুতে অস্থায়ী ঝিকমিকি। একটি ফোঁটা ঝরিয়া গেলেই চুয়াইয়া চুয়াইয়া আরেকটি সেখানে ঝুলিয়া পড়িতেছে। চারিদিকে টুপটাপ শব্দ, কেবল মাঝে মাঝে বাতাস সাড়া দিয়া গেলে ঘরের পিছনের প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছটির নীচে ঝরঝর করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যাইতেছে।

ঘরের মধ্যে এখন আর জল পড়ে না। রাত্রে পড়িয়াছিল, মাঝরাতে শুরু করিয়া ভোর হওযার আগে পর্যন্ত। বৃষ্টির দেবতার মুয়ে আগুন—এমন শত্রুতা তিনি ভামিনীর সঙ্গে করেন। বাতিতে তেল ছিল, দেশলাইয়ে কাঠি ছিল না। অন্ধকারে আন্দাজে কী ঠাহর হয় ঘরের কোনখানে জল পড়িতেছে না, পিঠ পাতিয়া পরীক্ষা করিয়া কত কষ্টে শুকনো কোনাটি বাহিব করিয়াছে। তারপর হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া সেখানে জিনিসপত্র জড়ো করা। বটিতে পা একটু কাটিয়া গিয়াছে গলাটা কাটিল না কেন ? একেবারে দু ফাঁক ! আজ হোক কাল হোক ও বঁটি দিয়া নিজের গলা তো কাটিতে হইবেই, রাত্রে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া সে হাঙ্গামা না হয় চুকিয়া যাইত, হাড়ে বাতাস লাগিত ভামিনীব !

কামিনী বলিল, বালাই ষাট ! অমন কথা কইতে নেই দিদি সক্কালবেলা। তা ঘবটা ছেয়ে নিলে হত।

কে ছাইবে ?

ওমা, কী গো ! দশ গাঁয়ের ঘর ছাইছে যে ঘরের মানুষ তোমার।

পরাশর তাড়াতাড়ি বলিল, ছাইব, এবারে ছাইব, পেথম বর্ষা নামল, কে জানে শালা ঘরের চালা জল ধরে না।

হ্যাঁ বটে ? জানতে না তুমি ? আর বাদলায় জল পড়েনি ঘরে ?

তা পড়িয়াছিল, মোটে দু-চারফোঁটা জল পড়িয়াছিল। তাই পরাশর তেমন ব্যস্ত হয় নাই। যা দাম খড়ের ! এবার নিশ্চয় ঘরের চাল মেরামত করিবে, দু-চারদিনের মধ্যে। কামিনীর স্বামী জগৎ হাসিতে আরম্ভ করিলে ভামিনীর অন্ধকারক্লিষ্ট মুখেও হাসি ফুটিয়া ওঠে। কামিনী মাথাটা একটু কাত করিয়া তার দিকে চাহিয়া থাকে। তার চোখেমুখে প্রশ্রয় ও সহানুভূতি। বিশ্বনিন্দিত দুরন্ত অকেজো ছেলের দিকে চাহিয়া মা যেন ভাবিতেছে, তোর মতো কে আছে সংসারে, যে তুই শুধু আমার আমার আমার ?

ভামিনী জগৎকে বলে, দেখছ ত ? শুনছ ত ?

জগৎ ভামিনীকে বলে, দাদা চিরডা কাল এই মতো। আর তা যদি বল তো তোমার এ বুনটিও কম লয়। মন খালি ফুরুৎ ফুরুৎ উড়ছে পাখির লাখান। কাজ যদি করবে তো একদম লন্ডভন্ড কাণ্ড, নয়তো কীসের সংসার, কীসের কী, হেথা যাচ্ছেন, হোথা যাচ্ছেন, বসে বসে গান গাচ্ছেন। ছেলেটা ভুঁয়ে পড়ে কেঁদে সারা, একবারটি কোলে নিতে কষ্ট।

জগৎ ধীরে ধীরে কথা বলে, তার আপশোশও যেন ধৈর্য দিয়া গড়া। কুটুমবাড়ি আবার মেরজাইটি গায়ে দিয়াছে, তাতে তাকে দেখাইতেছে সংসারধর্মের ব্যবস্থাপকের মতো। জগতের কথা শুনিতে শুনিতে তীব্র ঈর্ষা আর ভৎর্সনার দৃষ্টিতে ভামিনী বারবার কামিনীর দিকে তাকাইয়া থাকে।

কচি কচি পায়ে তার স্তন ঠেলিয়া কামিনীর ছেলে তার কাঁধ ডিঙাইয়া ওপাশে গিয়া পড়িবার চেষ্টা চালাইয়া যায়। দু হাতে আঁকড়াইয়া সে তাকে সেইখানে ধরিয়া রাখে।

কাল রাত্রেই জগতের জন্য মন্ডা আনিয়া রাখা হইয়াছিল, ভামিনী তাকে পিতলের থালায় কেনা মন্ডা আর ঘরের তৈরি লাড়ু ও মোয়া খাইতে দিল। তারপর জগৎ বিদায় হইয়া গেল। কাজের মানুষ সে, তার কাজ আছে। কাজ সারিয়া দুপুরে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিবে।

ভামিনী বলিল, শিগগির এসো, চট করে। রসুই সারতে কতখন ! পরাশর বলিল, বিড়ি আছে নাকি আর ?

আগেই জগৎ তাকে পরপর অনেক বিড়ি দিয়াছে, অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে এবারও দিল। ভামিনীর মুখে যে অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়া উঠিল তার তুলনা হয় না। বিড়িটা ধরাইয়া পরাশর সজোরে টান দিতে চড়চড় করিয়া অর্ধেকটা পুড়িয়া গেল। তামাক বিড়ির ধোঁয়াতে তার সুন্দর গোঁফজোড়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

কামিনী বলিল, বিড়ি খেতে পার বটে তুমি, হাঁ।

ঘরে কাদা হয় নাই, মেঝেতে ভামিনী গোবর মাটির পুরু ও শক্ত আবরণ সৃষ্টি করিয়াছে, জল বাহির হইবার ব্যবস্থাও ভালো। জিনিসপত্র বাহির করিয়া ভামিনী রোদে দিল। কাঁথা বালিশ চাপাইয়া দিল গোয়ালের নিচু চালটায়, এখানে ওখানে বাঁশ বাহির হইয়া পড়ায় বালিশ আটকানোর অসুবিধা নাই। সমস্ত বাড়িটার ছন্নছাড়া শ্রীহীন ভাবের রূপকের মতো দেখায় শূন্য গোয়ালটিকে, দেখিলে দুঃখ জাগে, একটি অনির্দিষ্ট দুর্বোধ্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে ইচ্ছা হয়।

আমি ঘর গুছোই দিদি। ঘাটে যাবে বলছিলে, সেরে এসো গে, যাও।

ভামিনী বাসন হাতে ঘাটে চলিয়া গেল। লুকানো দুটি থালা, দুটি গেলাস আর তিনটি বাটি বাহির করিয়াছে, কুটুমের কাছে আজ কোনোরকমে মান বাঁচিবে। কামিনীর অনেক বাসন আছে, জগৎ তার বাসন বাড়ায়, কমায় না। ঘাটের পথে কাদায় ভামিনীর পা ডুবিয়া যাইতে থাকে। কাদায় আরও অনেক পায়ের ছাপ আঁকা আছে। ঘাটের কাজ সারিয়া সকলে বোধ হয় ফিরিয়া গিয়াছে। ভামিনীর আজ বড়ো দেরি হইয়া গেল। ঘরের কাজে দেরি হইলে, সময়মতো নিখুঁতভাবে ঘরের কাজ সারিতে না পারিলে ভামিনীর কষ্ট হয়, বাঁচিয়া থাকায় যেন ফাঁকি পড়িতেছে।

কামিনী বলিল, ছেলেকে ধরো, ঘর গুছোই।

পরাশর বলিল, আমার ছেলে নয়, কাঁদবে।

পরিহাসে খুশি হইয়া কামিনী মুখের একটা ভঙ্গি করিল। ছেলেকে শোয়াইয়া দিয়া ঘরের কোণে জমা করা হাঁড়ি, ভাঁড়, টিনের কৌটা ইত্যাদি জিনিসগুলির মধ্যে একটি হাঁড়ি শিকায় তুলিয়া রাখিল। ঘর গুছানোর এই দায়িত্বটুকুই সে যেন চাহিয়া নিয়াছিল। দক্ষিণের ছোটো জানালার কাছে গিয়া বাহিরে চাহিয়া ডাক দিল, দেখবে এসো।

রোয়াক হইতে পরাশর সাড়া দিল, কী দেখব, আঁ ?

এসেই দ্যাখো না বটে নিজে ?

পরাশর উঠিয়া গিয়া দেখিল বিলের ধারে মাছের আশায় কুড়ি-বাইশজন লোক জমিয়াছে। বিলে অনেক মাছ, আজ সুযোগ পাইয়া ছিপ হাতে, কেঁচো হাতে লোভী মানুষ তাদের আয়ত্ত করিতে আসিয়াছে। বিলের দক্ষিণ তীরে ঘেঁষাঘেঁষি কতকগুলি ঘর, অনেকদিন আগে ওই ঘরগুলির চালা পরাশর ছাইয়া দিয়া আসিয়াছিল। জমি ও ঘর ধার দিয়া বাবুরা নূতন প্রজা বসাইয়াছিল, বাবুদের সঙ্গে চুক্তি করিয়া দল বাঁধিয়া পরাশর সাত দিনে সমস্ত ঘরের চালা বাঁধিয়া দিয়াছিল।

চুক্তির অর্ধেক টাকা কী করিয়া যেন বাতিল হইয়া গিয়াছিল, দলের অন্য ঘরামিরা গাল দিয়াছিল পরাশরকে। ঘরের বাসিন্দারা আজও বোধ হয় বাবুদের ধার শুধিতেছে, এতকালের মধ্যে

কারও চালায় এক আঁটি নূতন খড় ওঠে নাই। তবে নূতন খড় দিবার দরকারও হয় নাই নিশ্চয়। পরাশর যে ঘর বাঁধিয়া দেয় তাতে অত সহজে নূতন খড় দিতে হয় না।

জানি। তোমায় সবাই ডাকে।

এতটুকু জানালা দিয়া দুজনে বাহিরে তাকাইতে গেলে গায়ে গায়ে ঠেকিয়া যায়। একটু আমোদ, একটু উপেক্ষা আর একটু সমতার দৃষ্টিতে পরাশর কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার গালটা টিপিয়া দিয়া আবার বলিল, দুষ্টু মেয়ে।

তারপর রোয়াকে গিয়া ঘরের দুয়ারের সামনে সে বসিল। হাই তুলিয়া বলিল, কতকাল তোর সাজা তামাক খাইনি। এক ছিলুম খাওয়া দিকি কামিনী ?

জগতের কাছে দেশলাইয়ের কাঠি ধার করিয়া রাখা হইয়াছিল। তামাক সাজিয়া দিলে পরাশর আরাম করিয়া টানিতে আরম্ভ করিল, কামিনী খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার মুখের তীব্র বিস্ময়ের ভাব এখনও কাটিয়া যায় নাই। খসিয়া পড়া ঘোমটাটি সে খোঁপায় লটকাইয়া দিয়াছে।

কুমড়ো ডগা রাঁধিস কামিনী, ঝাল দিয়ে।

মাচা ছাইয়া সতেজ কুমড়ো গাছটি এদিকে ওদিকে শূন্যে লিকলিকে ডগা বাড়াইয়া দিয়াছে। বৃষ্টি হয় নাই, জল সেঁচিয়া ভামিনী বোধ হয় বর্ষার চেয়ে বেশি জল জোগাইয়াছে গাছটিকে। বুড়ো গাছে তাই এমন সবুজ পাতা আর কচি কচি ডগা। এবার গাছটি কাটিয়া ফেলিয়া কামিনী পুঁই আব লাউ মাচায় তুলিয়া দিবে।

ভামিনী ঘাট হইতে আসিয়া হাটে যাওয়ার তাগিদ দিল। বোন আর বোনের জামাইকে কুমড়ো ডগা খাওয়াইলে তো চলিবে না ?

এক প-র বেলা হল, যাও এবার।

এই যাই। হাট বসুক ! বাদলা গেছে কাল রাতে।

গ্রামের নিত্যকার তুচ্ছ হাট, ভোর হইতে না হইতে বসে। পরাশবের যুক্তি শুনিযা ভামিনী সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া বেতের বাক্‌সো খুলিয়া টিনের একটি ছোটো বার্লির কৌটা বাহির করিল। নাড়াচাড়ায় শব্দের অভাবে না খুলিয়াই বুঝা গেল ভিতরে কিছুই নাই। দুদিন আগে হঠাৎ পরাশর কিছু রোজগার করিয়া আনিয়াছিল, আজের জন্য তার একটা অংশ ভামিনী কৌটায় রাখিয়া দিয়াছিল। বাকিটা একরকম সঙ্গে সঙ্গেই সে দিন খরচ হইয়া গিয়াছে।

বাহিরে গিয়া ভামিনী কাঁদিয়া ফেলিল।

পরাশর্ বলিল, মরণদশা মোর, কান্না কীসের শুনি ? বলছি পয়সা আছে হাটের, উনি কাঁদতে লাগলেন।

দেখি পয়সা ?

বারান্দার এক প্রান্তে কিছু খড় জমা ছিল, পরাশর খড়ের গাদাটা দেখাইয়া দিল।—নিতাই এসে নগদ কিনে নিয়ে যাবে।

খড় বেচে হাটে যাবে ! এ বেলা যদি নিতাই না আসে ?

পরাশর অবজ্ঞাভরে একটু হাসিল, আসবে না নিতাই ? উয়ার বাপ আসবে। কাল বলে দিইছি পষ্ট করে, সকালে গিয়ে নগদ দিয়ে খড় লিয়ে আসবে, তবে কাল চালায় উঠব তোমার। না এসে যাবে কোথা ?

উ, তুমি ছাড়া ঘরামি নেই দেশে।

পরাশর কথা বলিল না। টান হইয়া গোঁফে হাত বুলাইয়া একবার শুধু উলটাইয়া দিল। জগতের সৃষ্টিকর্তাকে যেন বলা হইয়াছে, তুমিই সব নাও, স্বর্গে তেত্রিশ কোটি দেবতা আছেন !

আধঘণ্টার মধ্যেই নিতাই আসিল। তার গায়ে ফতুয়া, গলায় তুলসী মালা। মুখের গোঁফদাড়ি কামাইয়া ফেলায় কানে চুলের গোছা ঝোপের মতো দেখায়। খড়ের দিকে চাহিয়া বলিল, সুবিধে মনে হচ্ছে না তো পরাশর।

পরাশর বলিল, হাঁ বটে ! অমন কথা বলোনি নিতাইদা। মাস কাটেনি এই খড় কুঞ্জ খুড়োকে বেচেছিলে তুমি নিজে। বলেছিলে সব চাইতে সেরা। কাজ করিয়ে কুঞ্জ খুড়ো বললে, পয়সা তো নেই এখন পরাশর ! আমি খড় নিয়ে পাওনা শোধ করলাম।

নিতাই বিষণ্ণভাবে বলিল, অনেক জমে গেছে, বেচাকেনা একদম নেই। তোর এ খড় নিয়ে কী করব ভাবছি।

আমায় বেচে দেবে দুদিন বাদে। ঘর কাল ভেসে গেছে নিতাইদা, চালায় খড় না চাপালে নয়।

গাড়িতে খড় চাপানো হয়, নিতাই ঘনঘন পরাশরের দিকে তাকায়। পরাশরকে কাল অবশ্য অবশ্য কাজ আরম্ভ করিবার তাগিদ দিতেও মনে থাকে না। একটা বিড়ি বাহির করিয়া বলে, লে খা।

পরাশর হাত জোড় করিয়া বলে, তামুকের পর বিড়ি রোচে না নিতাইদা !

খড়ের দাম দিয়া নিতাই চলিয়া যায়।

পাঁচ দিনের মজুরির বদলে খড় পাইয়াছিল, খড়ের বদলে পাইয়াছে পয়সা। পরাশর যেন রাজা হইয়া গিয়াছে। গামছা কাঁধে ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।—বলো এবার কী আনব হাট থে। তোব জন্য কী আনব কামিনী ?

এতক্ষণ পরে ভামিনীর মুখে আজ প্রথম হাসি ফুটিল।

এখনও খুকি আছে নাকি কামিনী, এমন কবে শুধোচ্ছ ? মাছ এনো বেশি করে উয়ার জন্য, ছুঁড়ি মাছ পেলে কিছু চায় না। যাবে আর আসবে, বুঝলে ?

সত্যই অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে। ঘরের চালায় রোদে পুড়িয়া পুড়িয়া রোদের ঝাঁঝে আর পরাশর তেমন টের পায না, ভিজা পৃথিবী ধীরে ধীরে গরম হইয়া ভাপসা গরম উঠিতে থাকিলে সে বড়ো অস্বস্তি বোধ করে। বাড়ির সামনে আমবাগানের সোজা রাস্তায জল জমিয়াছে। গাছেব ছায়ায় ঝোপ-জঙ্গলের আগাছাগুলি এখনও শাখা ও পাতায় জল ধরিয়া রাখিয়াছে। বাগানের মধ্যে পরাশর খানিকটা আগাইয়া গিযাছে, ছপছপ কবিয়া ছুটিতে ছুটিতে কামিনী আসিয়া তার নাগাল ধরিল।

আমার জন্যে এনো একটা জিনিস।

কী জিনিস ?

কী আনিতে বলিবে কামিনী বোধ হয় ঠিক করিয়া আসে নাই। তাই ছুটিয়া আসিয়া হাঁপ ধরিয়া যাওয়ার ছলে ক-বার সে হাঁপাইল, অকারণে একটু হাসিল।

এই গিয়ে আলতা এনো একটা—তরল আলতা।

দুহাতে কামিনী হাঁটুর কাছেব শাড়ি তুলিয়া ধরিয়া আছে, হাঁটুর অনেক নীচে গোড়ালি ডুবানো জল। একটা পা একটু উঁচু করিয়া সে পরাশরকে দেখাইল।—ননদ তাড়াতাড়ি পরিয়ে দিলে, বললে, কুটুমবাড়ি যাবি বউ আলতা পরে যা। জল-কাদায় ধুয়ে গেছে দ্যাখ। আলতা পরে না গেলে ননদ বলবে, কেমন ধারা বোন তোর বউ, পায়ে দুপোঁচ আলতা দিলে না ?

ঘরের জানালার কাছে পরাশর পিছনে ছিল, কামিনী তার মুখ দেখিতে পায় নাই। এখানে তার মুখের একটু আমোদ একটু উপেক্ষা আর একটু মমতাও চোখে পড়িতে কোনো বাধা ছিল না। দেখিয়া কামিনী ঝিমাইয়া গেল, থামিতে পারিল না। আগে, এখন এবং পরে যার একসঙ্গে গতি মাঝখানে তাকে রোধ করবার ক্ষমতা আছে কার ? মানুষ তার জগৎকে শুধু একবার শূন্যে ছুড়িয়া দিতে পারে :

অসহায় বেদনা আর আক্রোশের মর্মে এই সত্যটাই তার গেঁয়ো মনের গেঁয়ো ধরনে অনুভব করিতে কামিনী বলিল, শিগগির এসো হাট থেকে, আঁা ? তোমাদের সাথে বোসপুকুরে নাইতে যাব। দিদি জানলে মানা করবে—দিদিকে লুকিয়ে যাব। রসুইঘরে দিদি রসুই করবে, ঘাটে নাইতে গেলাম দিদি—বলে বোসপুকুরে চলে যাব। তুমি আগে গিয়ে বসে থাকবে আমার জন্যে। একলা যেতে ডর লাগে, জনমনিষ্যি নেই চারিদিকে।

আরও বলিল কামিনী : দুপুরে আমায় হেথা-হোথা নিয়ে যেয়ো। পরাশর বলিল, কোথা যাবি দুপুরে ?

যেথা যেথা নিয়ে যেতে আগে সেইখানে ?

হাটে গিয়া আগে পরাশর মাছ কিনিল। এত এত সওদা কিনিতে লাগিল যেন ঘরে তার মোটে দুজন অতিথি আসে নাই। তরল আলতার কথা মনে পড়িলে দেখা গেল পয়সা শেষ হইয়া গিযাছে। ছোটো মনিহারি দোকানটির মালিক ভূধর বলিল, কেন বলছ ? ধাব তোমায় আমি দিতে পারব না। নেবার বেলায় নিতে জান, দেবার বেলায় আজ নয় কাল। তোমায জানা আছে।

তখন সেইখানে আবির্ভাব ঘটিল বাবুদের গোমস্তা নগেনের। গোমস্তাগিরিতে প্রাচীন হইয়াছে, এখন আর রাগিলেও রাগ করে না এবং রাগ না করিয়াও রাগ দেখাইতে জানে।

ভোর থেকে দুবার তোকে না ডাকতে গেল পরাশর ? কাছারি ঘরে জল পড়েছে, মেজোবাবু আগুন হয়ে আছেন, তোর মতলবটা শুনি ?

ঘরে আমার কুটুম এসেছে।

তোর ঘরে কুটুম এসেছে, মেজোবাবু এদিকে আমায় বড়োকুটুম বলে খাতির করছে। ও সব কথা রাখ। নগেন একটু থামে, ইতস্তত করে।—নগদ পাবি।

কাজের শেষে নগদ নয় শুধু, এক শিশি তরল আলতার দামটা পরাশরের আগাম চাই। শুনিযা নগেন কৌতুক বোধ করে।

আজও তোর বউ তরল আলতার বায়না ধরে ! দাও, ভূধর, এক শিশি তবল আলতা দাও ওকে।

পাগলা দীনুকে দিয়া পরাশর হাট আর আলতাব শিশি ঘরে পাঠাইয়া দিল। বাবুদের কাছাবি ঘরের চালায় সে এদিকে কাজ করিতে লাগিল, ওদিকে অন্নব্যঞ্জন রান্না করিয়া ঘবের ছায়ায় জগৎকে ভামিনী খাওয়াইতে বসাইল। ভোরে ডাকিতে গেলে আসে নাই, অনেক বেলায কাজে লাগিয়াছে, বাড়িতে খাইতে গিয়া সময় নষ্ট করিলে পুরা মজুরি পরাশর পাইবে না।

তা হোক, তার জন্য ও বেলা সব তোলা থাকিবে। ঘাটে স্নান করিয়া পেট ভরিয়া মাছ খাইয়া কামিনী ছেলেকে পাশে নিয়া একটু শুইয়াছে, কখন ঘুম আসিয়া গেল কে জানে। গড়াইয়া গড়াইয়া বেলা পড়িয়া আসিল, ঘুম ভাঙিয়া আলস্যে হাই উঠিতে লাগিল। সূর্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িলে কোথা হইতে কালো মেঘ আসিযা আকাশ ছাইয়া ফেলিতে শুরু করিল। কাল রাত্রের বৃষ্টি তবে শুধু বর্ষার জানান দেওয়া নয়, বর্ষা একেবারে আসিয়া পড়িয়াছে। ভামিনী তাড়াতাড়ি শিশি খুলিয়া কামিনীর পায়ে আলতা পরাইয়া দিল, বারবার আকাশের দিকে চাহিতে চাহিতে কামিনীও তাড়াতাড়ি জগতের সঙ্গে গরুর গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। তারও অনেক পরে কাছারিঘরের চাল হইতে পরাশর নামিয়া আসিল। যত বৃষ্টিই পড়ুক আজ আর বাবুদের কাছারিঘরে এক ফোঁটা জল পড়িবে না।

কালো কালো মেঘে ঢাকা আকাশের দিকে চাহিয়া পরাশর গভীর তৃপ্তি ও গর্ব অনুভব করিতে লাগিল।

# পারিবারিক

ভাবতে ভাবতে মা আবার বলে, কেউ স্টেশনে গেল না, জামাই মানুষ—

ইতিমধ্যেই মা দু-তিনবার কথাটা বলেছে, বনমালী একবার। আলোচনাও হয়ে গেছে যেটুকু হবার। এবার আর কেউ কান দেয় না কথাটায়। নন্দিনীর মনেই বিষয়টা সবার বেশি গুরুত্ব পাওয়া স্বাভাবিক, সেই আর একবার বলে, পা তো আছে, চলে আসবে। কে যাবে এ বিষ্টিতে ? নতুন তো নয় !

নিশ্চিন্তভাবেই বলে নন্দিনী, মিষ্টি করে একটু হেসে। বেশি যে পুরোনো নিখিল তা নয়, তবে বাড়ির লোকের দুর্ভাবনা সামলানোর দায়িত্ব তো তারই ! যদিও আগের মতো দুর্ভাবনা শত আনকোরা জামাইও বোধ হয় কোনো বাড়িতেই আনতে পারে না আর, বাস্তব ও সব বাড়াবাড়ি চেপে পিষে শেষ করে দিয়েছে।

ভাবতে ভাবতে মা আবার বলে, দু-তিনবার বলা কথাই বলে, কার ওপর রাগ করে যে শ্লেষ্মায় ভাঙা গলা চড়ায় ঠিক বোঝা যায় না,—চিচিঙ্গা খাবে জামাই, চিচিঙ্গা ? বলি, জামাই এসে শুধু চিচিঙ্গা খাবে ?

খেতে হলে খাবে ! এবারও নন্দিনীই কথা কয়, সবাই যা খায়, তাই খাবে !

যাবে যাবে, সব যাবে !—রাখাল ক্রুদ্ধ আপশোশের সঙ্গে মাথা নেড়ে নেড়ে বলে, ধর্ম ভাসিয়ে দিলে থাকে কিছু ! ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে নিতে না পারলে কোনো জাত টেকে।

কেউ কান দেয় না।

বাজার কাল করে রাখা হয়নি। যদি আসে নিখিল ভোব ভোর এসেই পৌঁছোবে, বাজার করার যথেষ্ট সময় থাকবে। আগে থেকে বেশি ও বিশেষ বাজার করে রাখলে যদি সে না-ই আসে ! ফেলা অবশ্য যাবে না কিছুই, খাবার লোকের সংখ্যা মোটেই কম নয় বাড়িতে কিন্তু খরচ তো আছে, অকারণ বাড়তি খরচ। আজ না এলে কাল হয়তো নিখিল আসবে।

আজ যদি আসে, বৃষ্টি মাথায় করেই একজন কেউ বাজার যাবে। যা পায়।

তবে বাজার আজ বসবে না।

এ এক সর্বনাশা দারিদ্র্য ঘনিয়ে এসেছে চারিদিক থেকে অকথ্য অদ্ভুত। তিন-তিনজন চাকরি করে বাড়িতে, আরও দুজন এই কদিন আগেও করত—বেকার হয়েছে খুবই সম্প্রতি, একজনের স্থায়ী গভর্নমেন্ট সার্ভিস। আজ অবস্থা দাঁড়িয়েছে প্রায় নুন আনতে পান্তা ফুরোবার মতো। মোট জড়িয়ে নেহাত কম হয় না মাসিক উপার্জন, দুশো টাকার বেশি, কিন্তু এমন আগুন লেগেছে জিনিসপত্রে সব যে মাসের গোড়ার দিকেই চড়চড় করে পুড়ে যায় প্রায় তার সবটাই, অর্ধেকের বেশি যে বাকি আছে মাসটা, সেটা কীসে চলবে কেউ ভেবে পায় না !

অসুখ-বিসুখও যেন পাল্লা দিয়েছে। অসুখ সংসারে লেগে থাকেই, চিরদিন থেকেছে সবার বাড়িতে, কিন্তু এ যেন রোগের নিত্য বাজার হাট, সমারোহ।

কাগজে বিজ্ঞাপনে উপদেশ ছাপা হয়, অপব্যয় কোরো না, অদরকারি কিছু এমন কিনো না, টাকার দাম বাড়বে পরে, জিনিস সস্তা হবে, এখন শুধু জমাও !

নন্দিনী খিলখিল করে হাসে, কী জমাবে দাদা ? খোলামকুচি ? অদরকারি জিনিস যেন কেউ কিনতে পারে !

রাখাল বড়ো ভাই, সে হাসে না। বুড়োটে বাপ বনমালী, সেও নয়। মেজোভাই দিব্যেন্দু যেন মাথা নেড়ে সায় দিতে দিতেই শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সেজো অসীম নিঃশব্দে হাসে, অল্পদিন আগে

ছাঁটাই হওয়া এবং তার কিছুকাল আগে বিয়ে করে থাকা সত্ত্বেও ! জোরে হাসে কল্যাণ, সুমতিরা। নন্দিনীর বলার ভঙ্গিটা বড়োই হাস্যজনক ছিল।

পারিবারিক গালগল্পের বা সবাই মিলে কাগজ পড়ার বৈঠক নয়, সকাল বিকাল ও রকম জমাট বাঁধার মতো গুরুত্ব কোনো পরিবারের আছে কিনা কে জানে ! বাইরে শেষরাত্রি থেকে মুষলধারে বৃষ্টি, তাই। বাড়ির কাঁচা অংশের খড়ো ঘর দুখানার এবং রান্নাঘর ও গোয়ালঘরের চালা সারাই হয়নি চার বছর, জলে ভেসে গেছে। গোয়ালটা শূন্য, বছর দুই গোরু নেই, চালাটা বর্ষার জলে গলে গেলেও কিছু আসে যায় না। কিন্তু দু-দুভাগে ভাগ করা চালাঘর দুটির চারিটি শোয়া-বসার কামরা থেকে বিছানাপত্র জামাকাপড় সব সরিয়ে আনতে হয়েছে বাড়ির এই পাকা অংশে। সাত বছর আগে, যুদ্ধের গোড়ার দিকের সেই ইংরাজি একচল্লিশ সালের মধ্যে যে পয়লা বৈশাখটি ছিল, সেদিন ভিত্তি পত্তন করে, তিন মাসের মধ্যে দুখানা পাকা ঘর তুলে দিয়েছিল ঠাকুর্দা প্রিয়রঞ্জন। দিয়ে দুমাসের মধ্যে মারা গিয়েছিল। সারাই চুনকাম কিছুই আর হয়নি এ পর্যন্ত, তবু আকাশটা বর্ষা হয়ে ভেঙে পড়লেও এ দুখানা ঘরে জল পড়ে না। বাতাস থাকলে অবশ্য দুটো জানলা দিয়ে ছাঁট আসে, আলকাতরা মাখানো তক্তা জোড়া দেওয়া জানালার পাট বন্ধ করলেও। জানালা দুটির সংস্কার করার কথা গম্ভীরভাবে আলোচনা হয়েছে অনেকবার, কিন্তু কাজে এ পর্যন্ত কিছু হয়নি।

পাশাপাশি দুখানা ঘর, মাঝের দেয়ালে প্রকাণ্ড একটা দরজা। লম্বা একটা হল করাব সাধই যেন ছিল প্রিয়রঞ্জনের, মাঝখানে দেয়াল তুলে ভাগ করতেই চায়নি, কিন্তু সেটা অবাস্তব অনর্থক সাধ বলে দুটো ঘর করতেই হয়েছে। জিদ বজায় রাখার জন্যই যেন বুড়ো লম্বায় চওড়ায় খাপছাড়া এই সাই দরজাটি বসিয়ে গেছে, কপাট খুলে রাখলে যেন মনে হয় ঘর বুঝি দুটি নয়। ইটের চেয়ে অনেক বেশি দাম কাঠের। আর কী মানে হয় বুড়োর পাগলামির ?

ঘর দুটিতে থাকে বড়ো রাখাল আর মেজো দিব্যেন্দু। রাখালের ছেলেমেয়ে এক পাল, দিব্যেন্দুর কিছু কম। ঘর নিয়ে দিব্যেন্দু সব চেয়ে বেশি ঝগড়া করেছিল বলেই বোধ হয় তার ঘরেব প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ সমান চাঁচের বেড়ায় আড়াল করে বনমালী বসবাস করে। বাড়ির মা, বনমালীর স্ত্রী, স্বামীর কাছে বহুকাল শোয় না। সে যেমন শীর্ণ, চুল-ওঠা কপালে তার যেমন চওড়া সিঁদুব, তেমনই সে পেট রোগা। চালাঘরেই সে থাকে, পুবের ঘরটায়। ঘরের পিছনেই ডোবা আর জঙ্গল, বেতবন।

বর্ষা সবাইকে কাঁচা অংশ থেকে পাকা অংশে আনলে মাঝের দবজায় মরচে ধরা শিকলটা অগত্যা খুলতে হয়। বনমালী চাঁচের বেড়ার ওদিক থেকে বেরিয়ে আসে এদিকে, তার অংশের পাশের জানালায় ছাঁট আসে বৃষ্টির মতো। গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জির ওপর আঠারো বছরের পুরানো গরমকোট চাপিয়ে কলার ফুটো কম্ফর্টার জড়িয়ে সে যেন বীরের মতো আত্মরক্ষার যুদ্ধ করে।

নন্দিনী কাগজ পড়ে সকালে।

গতকালের মফস্‌সল এডিশন শহরের পরশুর কাগজ।

কাগজ এলে টানাটানি হয়। একজনের হাতে কাগজ ধরা থাকে, পিছন থেকে তিন-চারজোড়া চোখ কাগজের পৃষ্ঠা হাতড়ায়। নেহেরু মেনেছে ? জিন্না ? দাঙ্গা কমেছে না বেড়েছে ? কী ঘোষণা গান্ধীর প্রার্থনায় ? জেলা শহরের গা-ঘেঁষা পাঁ ধুলচারিতে নুরুল হোসেন আর রাঘব আচার্য যে দুটো নৌকা আর এগারোজন গুন্ডাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখায় হইচই পড়ে গেছে শহরে সে খবরটা কি ছাপিয়েছে কাগজে ? কল্যাণ পাঠিয়েছিল খবরটা, তাদের কল্যাণ ! সাতগাঁর গুলি চালাবার খবরটা—ধানের জন্য তিনটা চাষা খুন আর একুশটা জখম—হাবিজুলের বউটার ওপর— ?

নন্দিনী টাটকা কাগজের কাছে ঘেঁষে না। ও রকম ছাড়া-ছাড়া ভাসা-ভাসা খবর পড়ায় তার তৃপ্তি নেই। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে সে তার অল্পবিদ্যা নিয়ে নিচু ক্লাসে বাংলা শেখায়, হাজিরা নিয়ে

বড়ো কড়াকড়ি। সেক্রেটারি কুমুদবাবু একটু তাকে আদর করতে চেয়েছিল, প্রথমে হেডমাস্টার মশায়ের ঘরে, তারপর জেলা বোর্ডের অফিসে তার খাস কামরায়।

হাজিরার কড়াকড়ি চলছে, ক্লাস নেবার খুঁটিনাটি কৈফিয়ত। কবে জবাব দেয় ঠিক নেই।

অনেকক্ষণ তন্নতন্ন করে কাগজ না পড়লে, শুধু মাউন্টব্যাটনের খবর নয়, বিজ্ঞাপন পর্যন্ত বুঝে শুনে না পড়লে তার ভালো লাগে না।

খবর আর বিজ্ঞাপন সব এক ধাঁচের—ধর্মশক্তি বৃদ্ধি এবং যৌনশক্তি বৃদ্ধি।

পড়তে পড়তে খিলখিল করে হেসে ওঠে বটে, পরিবারের কাউকে রাগায় কাউকে হাসায় বটে, বুকটা তার জ্বলে যায়। এমন একটা কাগজও কি এই স্বাধীনতা পাওয়া দেশে হয় না যাতে সত্যি খবর, সত্যি বিজ্ঞাপন ছাপে ?

কেন ? মিছে খবরটা কী ছেপেছে ?

অর্ধেক মিছে খবর, কত খবর বাদ দিয়েছে !

বড়ো গাল দিয়ে লেখে নিজেদের যেন কোনো দোষ নেই। ঝগড়া তো আরও বাড়বে ওতে !

বাড়ুক। আমরা সইব না আর। কেন সইব ? ব্যাটাদের মেবে লোপাট করে—ও খবরটা কিন্তু মিছে। বাজপুরে একটা জোতদারের ঘরও পোড়ায়নি। তুই জানলি কী করে পোড়ায় নি ? মিছেমিছি একপাল লোককে কোমরে দড়ি বেঁধে ধরে নিয়ে এসেছে ! ওরা তো স্বদেশি করেনি যে ধরবার জন্য—

বাজপুরে গিয়েছিলাম না কাল ? কোনো জোতদারের ঘর পোড়েনি। বরং কটা চাষির ঘরে আগুন দিয়েছিল।

খবরের কাগজের খবর আর মন্তব্য নিয়ে রোজই ভাসাভাসা কথাবার্তা হয়। ধীরে ধীরে একটা পারিবারিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। চারিদিকে এত সব বিরাট ঘটনা দুর্ঘটনের সমারোহ, এই ছোট্ট শহরেও যার ঢেউ এসে লাগে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের জীবনের সঙ্গে যোগ আছে অনুভব করে, কী হল কী হবে জানবার আগ্রহ সকলেব মনেই। কেমন একটা অসন্তোষ, অতৃপ্তি জাগে কাগজ পড়ে। আরও কী জানতে চায়, কী ভাবে জানতে চায়, কেন জানতে চায় ভালো বোঝে না কেউ, শুধু মনে হয় কেমন যেন একপেশে ব্যাখ্যা মন্তব্য নির্দেশ কাগজটার, খবর পরিবেশনেও। ছাঁটাই বাছাই করা ঘুরিয়ে বলা সত্যমিথ্যার মেশাল দেওয়া ঘন্টের মতো, মন পোড়ানো ঝাল দেওয়া।

দেরিতে আসা বছরের প্রথম খাঁটি বর্ষা একটু অপ্রস্তুতে ফেলেছে সকলকে। রান্না চড়াবার ব্যবস্থা করতে গিয়ে দেখা গেছে, এ বছব আর কোনোমতেই কাঁচাঘরে রান্না করা সম্ভব নয় বৃষ্টির সময়, রাঁধতে হলে এই পাকাঘরের মধ্যেই আয়োজন করতে হবে। কয়লার ছোটো আলগা উনানটা এনে ভিজে কাঠ জ্বালিয়ে ডাল ভাত সিদ্ধ করার আয়োজন খানিকটা এগিয়েছে। শহরে কয়লা মেলে না, একটা কেলেঙ্কারি হব হব হয়েছে কয়লা চালান ও বিতরণের ব্যাপারে শহরের কর্তা ব্যক্তিদের নিয়ে—ধামাচাপা পড়ে যাবে। বাজার আজ হবে না জানা কথাই। ডাল ভাত হলে চিচিঙ্গার চচ্চড়ি হবে। তরিতরকারির মধ্যে অদ্ভুতরকম সস্তা চিচিঙ্গা, ঝিঙাও প্রায় অর্ধেক দামে বিকোয়। সকালে তরকারির ঝুড়িতে শাক রাঁধার জন্য আগের দিনের সঞ্চয় করা ডাঁটা মুলোর পাতাগুলি আর চিচিঙ্গা থাকে—লুকানো একটা পটোল বা ছোটো একটা কানা বেগুন কোনো কোনো দিন দেখা যায়।

স্কুল হয়তো ছুটিই হয়ে যাবে আজ, বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত অফিস কাছারিও বসবে না। ঝড় বাদলেও হাকিম হুকিম ছাড়া সবার কাছারি যাওয়ার আজ্ঞা আছে, কিন্তু ওনারা নিজেরা যান না বলে না গেলেও চলে। সরকারি দপ্তরগুলিতে সব কিছুর সঙ্গে এ সব কড়াকড়িও শিথিল হয়ে এসেছে,

নিয়মকানুন মানার দিকে নজর দেবে কে, সবাই যখন পচন বাড়াতে ব্যস্ত তাতেই যখন লাভ। রাখালেরও আগের দিনের তাগিদ নেই, সুনীল নতুন কাজে ঢুকেছে, তারও না। তবে বিমলকে যেতে হবে যথাসময়ে, তার বেসরকারি চাকরি।

হঠাৎ বৃষ্টি ধরে গেলে ছুটতে হবে সকলকেই—নুন ভাত তো পেটে দেওয়া চাই। তাছাড়া, খিদেও তো আছে।

আমরা বাঁচব ? বাঁচব না—ধ্বংস হয়ে যাব। ধর্ম ভুলে গেছি, ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে পারি না—যে জোর দেখায় তার সঙ্গেই আপস। কী করে বাঁচব ? তরকারির ঝুড়িটার দিকে চেয়ে থেকে রাখাল চড়া গলায় ঘোষণা করে, ঘরে ধোঁয়া নইলে যেন তার কথার মানে অস্পষ্ট করে রাখবে।

সবাই শোনে, কেউ কান দেয় না। শুধু চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খাওয়া তো নয়, অনেক কিছুই জীবন অতিষ্ঠ করে তুলে সর্বদাই তাকে দিয়ে কথাটা ঘোষণা কবাচ্ছে। কত শোনা যায় ?

ছেলেপিলে কাঁদে কোঁকায়, ঝগড়া করে, চলতে থাকে তাদের সামলানো, শান্ত করা—কেমন যেন সমারোহ ছাড়াই ! আগের দিনে ঘরবাড়ি সরগরম হয়ে উঠত বাচ্চাদের চেঁচামেচি কাঁদাকাটার সঙ্গে তাদের আওয়াজ ছাড়িয়ে ওঠা বড়োদের বিরক্তির ঝংকার মিশে। তেমন বিরক্ত কেউ যেন আব হয় না, এমন অসহ হয়ে উঠেছে বেঁচে থাকা, তবু অথবা হয়তো সেই জন্যেই—আশ্চর্য এক ধৈর্য এসেছে সবার মধ্যে, অপরূপ এক সহ্যশক্তি। তবে সে রকম আদরও কেউ আর করে না, বাচ্চাকাচ্চাকে হরদম বুকে চেপে চুমু খেয়ে সোনা আমার মানিক আমার বলে বলে আবেগে গলে গিয়ে এবং গলিয়ে দিতে ব্যাকুল হয়ে—কল্পনার মোটাসোটা অমন সুন্দব কোলের ছেলেটার পর্যন্ত ভাবাবেগের বাজারে দর নেই। এখনও মাই ছেড়ে বোগা বিচ্ছিরি হতে পারেনি ছেলেটা, বুকে দুধও পায় মোটামুটি—কল্পনার স্বাস্থ্য অসাধারণ ভালো ছিল।

আধভেজা কাপড় পরে আছে কল্পনা, এখানে ওখানে ছেঁড়া। তা, ছেঁড়াকাপড় সবাই পরে, যে অবস্থায় পৌঁছোবার অনেক আগেই কাঁথা-ন্যাকড়া হয়ে যেত ধুতিশাড়ি, সে অবস্থাতেও ! তবে, একটু জ্বর এসেছে কল্পনার এই যা। এসেছে দিন তিনেক।

দালানে মেলা বড়োবউ অতসীর শাড়িখানা শুকিয়েছে। রেশনের নতুন শাড়ি।

দাও না দিদি, ভিজে কাপড়টা ছাড়ি ? শীত করছে।—হঠাৎ কল্পনা অনুরোধ জানিযে বসে, একটু যেন দাবির মতো জোরের সঙ্গে। মনে তার একটা জ্বালা ছিল !

নেয়ে উঠে আমি পরব কী ?

জ্বরতপ্ত মুখ আরও লাল হয়ে ওঠে কল্পনার !—

এবারও রেশনের কাপড়টা তো কায়দা করে—মরুক গে যাক।

ঝিমিয়ে পিছিয়ে যায় কল্পনা। জ্বরের দুর্বলতায় নয়, কলহ করার তেজ জ্বরে বাড়ে বই কমে না,—কিন্তু কেমন যেন উৎসাহ পায় না মনের মধ্যে !

কী কায়দা শুনি ? ঘাড় তোলে অতসী, কীসের কায়দা ? শোনো দিকি কথা একবার !

শঙ্কিত চোখে নন্দিনী চেয়ে থাকে। কিন্তু আর এগোয় না বিবাদ, চোখে চোখে খানিক তাকিয়ে থেকে দুজনে ঝামটা মেরে শুধু মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ঝগড়াঝাঁটিরও যেন কী হয়েছে আজকাল। জমে না !

ভিজে কাপড় পরে আছ ? বলতে পার না ? বললে একখানা শুকনো কাপড় তোমার জোটে না ? নাও, এটা পরো।

কল্যাণ মেজোবউদিকে একখানা সরুপাড় ধুতি এগিয়ে দেয়।

কল্পনা হেসে বলে, ধ্যেত।

কেন ? কী হয় পরলে ? নন্দিনী বলে, কত সধবা থান পেলে বর্তে যাচ্ছে !

কল্পনার বড়োই শীত করছিল, দ্বিধাভরে বলল, পরব ?

তার দ্বিধা আর অস্বস্তি দেখে নন্দিনী ধুতিটা নিয়ে নিজের পবনেব শাড়িখানা ছেড়ে ফেলল। শাড়ি তার আরও আছে, তবে একটু ভালো শাড়ি সে কখানা, সর্বদা পরতে মায়া হয। তাছাড়া, কিছুক্ষণের জন্যও ধুতি পরে থাকার কথা ভাবতে তার নিজেরও যেন কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। ওটাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয।

বেলা দশটা নাগাদ বৃষ্টি কমে এল। সুনীল চিচিঙ্গা চচ্চড়ি দিয়ে পাতলা খিচুড়ি খেয়ে তখন বেরোবার উপক্রম করছে। ভালো ছাতিটা সে নিয়ে যাবে না বাড়ির দরকারে রেখে যাবে, এই দাঁড়িয়েছে পারিবারিক সমস্যা। দেরি তার হয়েছে, আর একটু দেরি করে দেখবে বৃষ্টি ধরে কি না ? সৌভাগ্যের বিষয়, আপিস বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয সুনীলের, মোটে দশ-বারোমিনিটের পথ। বৃষ্টি একবার ধরলে সেই ফাঁকে ছাতি ছাড়াই চলে যেতে পারবে, আর এক দফা বর্ষণ শুরু হবার আগেই।

বাড়ির আর দুজন আপিস যাত্রীও ধীবে ধীবে প্রস্তুত হচ্ছে।

এমন সময় নিখিল এল সাইকেল রিকশায়। ভিজে সে চুপসে গেছে, তাব জিনিসপত্রও রেহাই পায়নি। জিনিস সে সামান্যই সঙ্গে এনেছে, মোটে দুদিন থাকবে। দশদিনের ছুটি, তার মধ্যে তিনটে দিনই আসা যাওয়ার জন্য বরাদ্দ। দেশে নিজের বাড়িতে তিন দিন থাকতে হয়েছে, একরাত্রি গেছে সেখান থেকে এখানে আসতে। নন্দিনী আগে থেকে শ্বশুববাড়ি গিযে থাকলে ভালো হত, তা সে তো আর হবার নয়। সাত মাস বলে নয় শুধু, এ পথে বাত্রে মেয়েছেলের যাতায়াত যেমন জঘন্য তেমনই বিপজ্জনক।

রিকশা চালক ছোঁড়াটা আরও বেশি ভিজেছে, পিঠেব কাছে দুফালা হয়ে ছেঁড়া খাকি ময়লা শার্টটা এঁটে গিয়েছে, পিঠের চামড়ার সঙ্গে। ব্যাগ আর বিছানা ঘরে পৌঁছে দিয়ে সে ঘরের মধ্যেই দরজার চৌকাঠের কাছ ঘেঁষে পরিবারটির দিকে পিছন ফিবে দাঁড়িয়ে জামাটা খুলে নিংড়ে নেয়, কাপড় চিঁপে চিপে জল ঝবায়। জামা দিয়ে গা মুছে সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকে। বৃষ্টি থামার জন্যে একটু অপেক্ষা করাই বোধ হয় তার মতলব।

বেশি পয়সার লোভেই সে অবশ্য এই বৃষ্টিতে নিখিলকে পৌঁছে দিতে রাজি হযেছে, তবু তাকে রাস্তায় নেমে যেতে যেন বলা যায় না, অন্তত কিছুক্ষণ দাঁড়াতে না দিযে

শুধু রাখাল নিচু গলায় বলে, ব্যাটা মুসলমান কী না না জেনে ?

সে কথায় কেউ কান দেয় না।

ইলিশ মাছ দুটি হাতে করেই নিখিল নেমেছিল। মস্ত দুটো ইলিশ, বেশ চওড়া।

মাছ এনেছ ? মা যেন আশীর্বাদ করে জামাইকে।

ভিজে কাপড় ছেড়ে নিখিল বনমালীর এক পায়ের পাতায় এক হাতের একটি আঙুল ছুঁইয়ে প্রণাম পর্ব শেষ করে, আর কারও পায়ের দিকে তাকিয়েও দ্যাখে না।

বলে, খারাপ হয়ে গেছে বোধ হয মাছ দুটো।

সেটা টের পাওয়া যাচ্ছিল।

খারাপ হয়ে যাবে না ? নন্দিনী বলে মুখ ভার করে, এ ভাবে আনলে কখনও মাছ থাকে ?

একটু বরফ পেলাম না। থলিটাতে বড়ো বড়ো বরফের চাকা ভরে—

ভেজে আনলেই হত !

আসবার সময় কিনে নিলাম বাজার থেকে। ভাবলাম বরফ কিনে—

যাক, বেশ করেছ। দুধ ছাড়া চা খেতে হবে কিন্তু। শুধু এইবার—পরের বার দুধ এসে যাবে। তোমার জন্য চিনি তোলা আছে, গুড়ের চা নয়।

এবার নন্দিনী হাসল।

# ট্রামে

কিছুদিন হল চাকরি করছি।

আজ বাদে কাল চৈত্র শেষ হয়ে যাবে। বেলা দশটাতেই রোদের তেজের বাড়াবাড়ি রাগিয়ে দেয়। শহরতলিতে বাড়ি। মিনিট চারেক হেঁটে বড়ো রাস্তায় এসে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছি। স্নানের সিক্ততা ভালো করে উঠে যাবার আগেই শরীরটা কাপড় জামার নীচে বেশ ঘেমে উঠেছে। ট্রামে উঠলে আরাম পাব—ফ্যান আর ট্রাম চলার বাতাসে।

দু স্টপেজ তফাতে ডিপোর সামনে ট্রামটি ছাড়বার জন্য অপেক্ষা করছে দেখতে পাচ্ছি। এক রকম খালি অবস্থাতেই ট্রামটি আমার সামনে এসে দাঁড়াবে, ইচ্ছামতো যে কোনো সিটে বসতে পারব। কথাটা ভাবতেও বেশ আরাম অনুভব করি, নিজেকে রীতিমতো ভাগ্যবান মনে হয়। শহরতলিতে ট্রাম ডিপোর কাছাকাছি বাস করি বলেই তো দাঁড়িয়ে থাকার কষ্ট, পঁচিশ-ত্রিশমিনিট দাঁড়িয়ে থাকার ভয়ানক পরিশ্রম এড়িয়ে যেতে পারি। কালিঘাট পৌঁছবার আগেই সব সিট ভর্তি হয়ে যাবে। দাঁড়ানো মানুষের ভিড় ক্রমে বাড়তে থাকবে, পাদানি পর্যন্ত সমস্ত ফাঁকা স্থানটুকুতে গাদাগাদি করে দাঁড়াবে সব কচি বুড়ো মাঝবয়সি আপিস যাত্রী—সায়েব আর টমিও থাকবে কিছু।

আমি বসেই যাব।

নিজের পছন্দ করা সিটে হেলান দিয়ে সিগারেট টানব আর দাঁড়ানো মানুষগুলির সান্নিধ্য অনুভব করতে করতে উপভোগ করব বসে থাকার আরাম। এতগুলি ভদ্রলোককে একসঙ্গে কষ্ট পেতে দেখে সমস্ত পথ পুলকিত হয়ে থাকব। আপিসের ছুটির পর অবশ্য দাঁড়িয়েই ফিরতে হয়। ডালহৌসি থেকেই গাড়িগুলি বোঝাই হয়ে এসপ্ল্যানেডে আসে। বসে বাড়ি ফিরবার একটা কৌশল অবশ্য আছে, কিছু সময় খরচ হয়। বিপরীত দিকের গাড়িতে চেপে ডালহৌসি পাক দিয়ে এলে বসে বসেই বাড়ি ফেরা যায়। কিন্তু নিজস্ব নির্দিষ্ট চেয়ারে এতক্ষণ বসে কাজ করে আসার জন্যই বোধ হয় বসবার তাগিদটা তেমন জোরালো থাকে না। বোঝাই গাড়িতেই উঠে পড়ি। ফার্স্ট ক্লাসে ওঠা অবশ্য একেবারেই সম্ভব হয় না, সেকেন্ড ক্লাসে উঠে ঠেসাঠেসি করে কোনো রকমে দাঁড়ানো যায়। কিছু ধরে দাঁড়াবার দরকার হয় না, গাড়ির থামা ও চলার টাল সামলাতে মানুষের অবলম্বন পাই। বেশ লাগে দাঁড়াতে। আরাম পাই। আনন্দ হয়। চারিদিক থেকে মানুষের নরম দেহের জোরালো চাপ, মানুষের ঘামের গন্ধ, মানুষের নিশ্বাসের ভাপসা বাতাস আর মানুষের দেহের উত্তাপে জমজমাট ভেজা গরম, এ সব যেন জীবন্ত করে তোলে আমাকে। গাড়ির ভিড় দেখে স্টপেজে দাঁড়ানো সুন্দরী মেয়েটি মুখ বাঁকায়, তার কোমল তরুণ রোমাঞ্চময় দেহে চোখ বুলিয়ে মনে হয় ভিড়ের স্পর্শ ঢের বেশি স্নায়বিক, ঢের বেশি উত্তেজক।

বাড়ি ফিরে খালি গায়ে দক্ষিণের খোলা বারান্দায় দাঁড়াই, দূর সমুদ্রের বাতাস সামনের জলা আর খোলা মাঠ ডিঙিয়ে প্রথমে আমাকে স্পর্শ করে শহরে ঢোকে। স্পষ্ট বুঝতে পারি সে শুধু বাতাস, নিশ্বাস নয়। দক্ষিণা বাতাসে গায়ের ঘাম শুকিয়ে গেলে চান করি, খাবার খেয়ে খিদে মেটাই, চা পান করি। গড়িয়ে গড়িয়ে সন্ধ্যা আসে।

ট্রাম এল।

তিনটি বাঙালি পুরুষ আর একটি বিদেশি মহিলা ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছে। লেডিজ সিটে না বসে মহিলাটি একেবারে সামনের বাঁদিকের সিটে বসেছে। ওখানে বসার সুবিধা আছে। জানালা দিয়ে জোরে

বাতাস গায়ে লাগে আর ঘাড় বাঁকিয়ে পাশের জানালা দিয়ে দ্রুত অপসিয়মাণ ঘরবাড়ি দোকানপাট দেখার বদলে সোজাসুজি সামনে তাকিয়ে দূরকে কাছে আসতে দেখে একটু সহজে সময় কাটানো যায়। আমি তাই মাঝামাঝি একটি সিটে বসলাম। সময় আমার কখনও কাটাতে হয় না, আপনিই কেটে যায়।

বিদেশি মহিলাটির পোশাক আর চেহারা দুই-ই বেশ জমকালো। ত্রিশ অথবা পঁয়তাল্লিশ বয়স, উথলে ওঠা দুধের মতো মাঝবয়সেব যৌবন পরিপুষ্টির ফাঁকিতে ফেঁপে ফেনিয়ে উঠেছে। স্ত্রৈণের মনে শ্রদ্ধাপূর্ণ লালসা যেন জাগাবেই, কিছুতে রেহাই দেবে না।

প্রত্যেক স্টপেজে লোক উঠে গাড়ি ভবে যেতে লাগল। পর পর বই হাতে দুটি মেয়ে উঠে একজন ডানদিকের এবং অন্যজন বাঁদিকের লেডিজ বেঞ্চ দুইটি দখল করল। কালীঘাট থেকে গাড়ি ছাড়বাব পব দেখা গেল সাতজন দাঁড়িয়ে আছে। লেডিজ বেঞ্চ দুটিতে দুজনের সিট খালি আছে, কিন্তু নারীজন্ম না নিলে সেটা দখল করা সম্ভব নয়। একটি মেয়ে অন্য বেঞ্চে উঠে গেলে অন্তত নূতন আর একটি মেয়ে গাড়িতে না ওঠা পর্যন্ত দুজন পুরুষ বসতে পারে। কিন্তু দুজনেই তারা নির্বিকার ভাব ফুটিয়ে মেরুদণ্ড আর ঘাড় সিধে করে বসে আছে। মেয়েদের জন্য রিজার্ভ করা সিট, পুরুষের শিভাল্‌রিহীনতার প্রামাণ্য বিজ্ঞাপন, পুরুষের পাশে বসলে নারীদের অশুচি হবার ঘোষণা। লজ্জায় আর একটা সিগারেট ধরালাম।

গত রবিবার একজন ভবানীপুরে আমাকে গ্রেফতার করে তার বালিগঞ্জের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। লেখা শোনাবেন। শুনিয়ে প্রশংসা শুনবেন। রূপেগুণে যৌবনের তেজে স্বাধীন চিন্তায় কর্মপটুতায় পুরুষকে সমান ভাবায় আর যুগান্তর ঘটাবার পিপাসায় তিনি অসাধারণ। আগাগোড়া সমস্ত পথটা দাঁড়িয়ে যেতে হয়েছিল। নেমেই বলেছিলেন দেখলেন ? একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখেও কেউ একটা সিট অফার করল না ! এই সব অমানুষ আমার দেশের মানুষ ! আমি কিছু না ভেবেই বলেছিলাম কেন, অনেকেই তো দাঁড়িয়েছিল। তিনি মাথায় ঝাঁকি দিয়ে বলেছিলেন, আপনি আবাব অনেক মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন কোথায় ?

তখন বলেছিলাম, কী জানো পুরুষের পাশে তুমি বসবে এটা কেউ ভাবতেও পারেনি। বেয়াদবি করতেও কেউ সাহস পায়নি। একজন উঠে সিট অফার কবলে তুমি বসতে ?

নিশ্চয বসতুম ! কেন বসব না ! আর বসি বা না বসি—

সে বসত না। আমি জানি সে বসত না। স্পর্শ বাঁচিযে তাকে দাঁডাবার স্থান দিতে সকলে যে ভাবে গাদাগাদি ঠেসাঠেসি করে তালগোল পাকিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল সেটা গ্রহণ কবেছিল সকলেব উচিত কাজ বলে, তার প্রাপ্য বলে। এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেনি, মর্মাহত হয়নি।

সামনের সেই বিদেশি মহিলাটিব পাশের স্থানটি খালিই পড়ে আছে।

একজন দাঁড়ানো যাত্রীকে বললাম, ওখানে গিযে বসুন না ?

ভদ্রলোক পানের রসে ঢোক গিলে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে অকারণে একটু হাসল, শুধু বলল হেঁ হেঁ হেঁ—

আমি সাহস দিয়ে বললাম, ওটা লেডিজ সিট নয়।

সে একগাল হাসল, ঠোঁট বেয়ে পানের রস গড়িয়ে পড়ার আগে শুষে নিল, কত লোকেব দৃষ্টি তার দিকে আকর্ষিত হয়েছে চট করে দেখে নিয়ে বলল, আমরা ও সব পারিনে মশায়। সংকোচ লাগে আর কি, বুঝলেন না ? অভ্যেস তো নেই !

তখন তাকিয়ে দেখি পাতলা ফিনফিনে পাঞ্জাবিতে আবছা ঢাকা গেঞ্জি গায়ে ঘাড়ছাঁটা এক ছোকরা দাঁড়ানো মানুষগুলিকে বেপরোয়া ঠেলে ঠেলে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। সোজা গিয়ে সে বিদেশি মহিলাটির পাশে বসে পড়ল, মুখের বিড়িটাতে শেষ টান দিয়ে তার মুখের সামনে হাত বাড়িয়ে জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিল।

কন্ডাক্টর বলল, টিকেট ?

ছোকরা বলল, মন্‌থলি। দেখনে মাংতা ? ওই হোথায় একদফা দেখিয়েছি কিন্তু বাবা হ্যাঁ। দেখো আবাব দেখো।

কন্ডাক্টর যুবক, মুখখানা সুশ্রী। দাড়ি কামিয়ে মুখে স্নো মেখেছে বলে মনে হল। চোখেমুখে কলেজ স্টুডেন্টদের মার্কামাবা সুপবিচিত প্রতিভাব নিবু নিবু ছাপ দেখেও স্বস্তি বোধ কবলাম। কয়েক বছরের মধ্যে মুখের চামড়া শক্ত হয়ে এ কলঙ্ক ঢেকে যাবে। প্রতিফলিত উজ্জ্বলতা নিভে গিয়ে দুটি চোখে দেখা দেবে বজ্র ও বিদ্যুৎ ভবা মেঘের মতো খাঁটি বিদ্রোহ ভরা ঘৃণার ছায়া।

পাঁচটার কিছু আগেই আপিস থেকে বেবিয়ে পড়লাম। আজ দেখলাম প্রথম বোঝাই ট্রামখানার সেকেন্ড ক্লাসেই ভিড় বেশি। ফার্স্ট ক্লাসে দাঁড়ানো চলে। উঠবাব ও দাঁড়াবার জন্য স্থানসৃষ্টিব লড়াই শেষ হলে বহুদিনের বদভ্যাসের ফলে অজানা নূতন অভিব্যক্তি আবিষ্কাবের আশায় দৃশ্যমান মুখগুলিতে একবার চোখ বুলিযে নিলাম। মুখে মুখে মিল নেই, কিন্তু সব চেনা মুখ, আত্মীযেব মুখ। এই অঘটনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, বিশেষ খারাপ লাগে না। তাই অনায়াসেই অন্যমনস্ক হযে গেলাম। আমার অতি নিকটে যে একটা অন্যায় ঘটছে সে বিষয়ে তাই সচেতন হলাম খানিক পরে।

সামনে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খাঁটি বিদেশিনি কি ফিবিঙ্গি বিদেশিনি ঠিক বুঝলাম না। তবুণী বিনা রোগ ব্যারামে ছিপছিপে এবং মনোবম শ্রীমতী। লেডিজ সিটগুলি ভবে গেছে। দবজা আর লেডিজ সিটের মাঝখানে একজনের যে সিটটি থাকে সেটি দখল কবে আছে একজন বাঙালি যুবক—সবল সুস্থ চেহারার গম্ভীর শান্ত ভদ্র যুবক। সামনে মেয়েটিকে দাঁড় করিযে রেখে সে এতখানি নির্বিকার চিত্তে বসে আছে যে তার নিষ্ক্রিয় অভদ্রতা ঔদ্ধত্যের মতো বিশ্রী ও স্পষ্ট হযে চোখে পড়ছে। ক্ষুব্ধ হলাম এবং একটু খুশিও হলাম।

ভিড়ের ঠেলায বিদেশিনি মেয়েটিকে একটু ধাক্কা দিয়ে ফেললাম। ক্ষমা চাইবাব আগেই সে সোজাসুজি আমার মুখের দিকে চেযে একটু হেসে আর সায দেবাব ভঙ্গিতে দুবাব মাথা নেড়ে যেন স্পষ্টভাষায় জানিযে দিল ক্ষমাব প্রশ্নই ওঠে না, কাবও কোনো দোষ নেই, বর্তমান অবস্থায এটা একান্ত স্বাভাবিক ঘটনা।

তখন আর চুপ কবে থাকা সম্ভব হল না। মনে হল সমষ্টিব সমস্যা ছাড়িযে ব্যাপাবটা এখন ব্যক্তিগত প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে। ছেলেটিকে বললাম, আপনি একটু উঠলে—

সে বলল, কেন ?

তাব মুখের ভাবের এতটুকু পবিবর্তন ঘটল না।

আমি চুপ করে গেলাম। খানিক পরে একটি বাঙালি তবুণী উঠে বিদেশি মেযেটিকে নিষ্প্রভ করে তার পাশেই দাঁড়িয়ে বইল। মাঝে মাঝে সে ছেলেটির দিকে তাকাচ্ছে লক্ষ কবলাম—কী গভীব অবজ্ঞা আর তিরস্কার তার বড়ো বড়ো দুটি চোখে।

বিদেশি মেয়েটি বলল, প্লিজ—

দেশি মেয়েটির ডান হাতের কনুই তার পাঁজরার নীচে খোঁচা দিচ্ছিল। দেশি মেযেটি নীবরে তাকে রেহাই দিয়ে চোখের বজ্রে ছেলেটির পিপাসু চোখ দুটিকে কানা করবার চেষ্টা কবেই প্যানেলের একটি বিজ্ঞাপনের দিকে তাকিযে রইল। একটি ফাঁপানো বেলুনের মতো একটি শিশুর ছবি। কোন খাদ্য খাওয়ালে শিশুরা এ রকম ভয়ংকর মোটা হতে পারে তারই বিজ্ঞাপন। অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করবে না, দেশি মেয়েটির বিদ্যুৎ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। দেখলাম বিজ্ঞাপনের কথাগুলি পড়তে তার ঠোঁট নড়ছে।

বিচারের জন্য, বিশ্লেষণের জন্য, সমালোচনার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। কিন্তু কী দিয়ে বিচার করব, ওর মনের সত্যমিথ্যার দলিল তো পাইনি আমি ! গাড়ির আর যে কোনো লোক ওখানে

বসে যদি জিজ্ঞাসা করত, কেন ? আমি তার মানে বুঝতাম ! এ ছেলেটি আমার অনুরোধের জবাবে প্রশ্ন করেনি, বলে দিয়েছে সে উঠবে না। একটি মেয়ে যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে তা গ্রাহ্য করে না। মেয়েটির সুঠাম সুন্দর দেহ তার চোখ দুটিকে আনন্দ দিচ্ছে বলেই তার কাছে মেয়েটির কোনো পাওনা সৃষ্টি হয়নি।

পরের স্টপেজে গাড়ি থামতে গলাবন্ধ কোট গায়ে ছাতি বগলে পুঁটুলি হাতে প্রৌঢ় বয়সি এক ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্ত ভাবে আগে একটি ঘোমটা টানা মহিলাকে গাড়িতে তুলিয়ে নিজেও উঠে পড়ল। কোন ম্যাজিকে জানি না সেই জমজমাট ভিড় ফাঁক হয়ে মহিলাটিকে এগিয়ে যাবার পথ করে দিল, সেই পথে পিছু পিছু তার সঙ্গীও তাকে অনুসরণ করল। সেই ছেলেটি তার একজনের সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মহিলাটিকে উদ্দেশ করে বলল, এখানে বসুন।

চেয়ে দেখলাম তার মুখের ভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি।

বাড়ি ফিরে বারান্দায় খালি গায়ে দাঁড়িয়ে দক্ষিণা বাতাসে ঘাম শুকিয়ে স্নান করলাম। পেট ভবে খাবার খেয়ে পান করলাম চা। গড়িয়ে গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এল। লেখার তাগিদ ছিল, কিন্তু আজ আর লেখা হবে না। মাথায় ভাবনা জুটেছে। টেবিলে ভারী কাচচাপা কাগজ আর কলমটির দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। একতলার কোণের ঘরে রেডিয়োতে গান হচ্ছে। পাশের বাড়িব মেয়েটি তার মিষ্টি গলা সাধছে। দূরে কে যেন বাঁশিও বাজাচ্ছে করুণ সুরে। বড়ো রাস্তা থেকে ট্রাম চলবার আওয়াজ কানে এল। তাকিয়ে দেখি যে, ট্রামগাড়িটা বাড়িটার আড়ালে পড়েছে, কিন্তু উপরের তারে নীলাভ দ্যুতির চমক তুলে কী যেন ইঙ্গিত করছে আমাকে।

# ধর্ম

বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ দুজনের বেধে যায়। তীক্ষ্ণ ধারালো কথায় পরস্পবকে এরা কুচিকুচি কবে কাটতে থাকে, মুখের সঠিক সূক্ষ্ম ভঙ্গি সমর্থন কবে চলে কথাকে, ভিতরের জ্বালার তাপে আব আক্রোশের চাপে ফরসা মুখ দুটি লাল হয়ে যায়—তমসার বেশি হয়। সৌম্যেনের দাড়ি কড়া, অনেক যত্নে কামানোর পরেও কূপের ভিতর থেকে লোমের গোড়া উঁকি দেয়।

তমসা বেশ ফবসাই।

গলা তাদের চড়ে না, বরং কথার ধার বাড়বার সঙ্গে আওয়াজ কমে আসে। চাপা হিসহিসানির মতো শোনায় সময় সময়, তাদের ভেতরে যেন সাপ আছে, ঝগড়া কবছে সেই সাপ দুটি, তারা নয়। বুদ্ধি চোখা, জটিল চিন্তা নিয়ে দ্রুত পাক দেওয়া মনের অভ্যাস, চিন্তার স্পিডও অনেক। গলার জোরে গায়ের ঝাল ঝাড়বার দরকার তাদের হয় না, গালাগালি তো একেবারেই অচল। নতুন নতুন বলার কথা খুঁজে না পেয়ে একটি মাত্র খোঁচার পিছনে তেজ ঢেলে দিতে হয় না, সবটুকু, যা মনে আসে, তাই বলতে হয় না। বিশ্লেষণমূলক সমালোচনা চলে, কথা কাজ ও ব্যবহারের শত খুঁটিনাটি ত্রুটিবিচ্যুতির ;—একে প্রমাণ করে অপরের স্বার্থপরতা, ঔদাসীন্য, অবিবেচনা, আলস্য, অপটুতা, অকর্মণ্যতা, অন্যায়, অবিচারকে, না-বোঝাকে, স্নেহমমতা ভালোবাসার অভাবকে। হৃদয়মন টুকরো টুকরো হয়ে যায় দুজনের। জীবনের সমস্ত সঞ্চিত ক্ষতে রক্ত ঝরতে থাকে।

তমসা কেঁদে থামে। অথবা থেমে কাঁদে।

সৌম্যেন থামে, যে কোনো বই তুলে উলটো সোজা যে ভাবে হোক খুলে মুখেব সামনে ধবে গুম হয়ে থাকে।

খানিক পরে একজন কথা কয়,—সহজ স্বাভাবিক সাধারণ কথা। কোনো দিন তমসা, কোনো দিন সৌম্যেন।

আরম্ভ হওয়ার একমুহূর্ত আগেও যেমন যুদ্ধের ইঙ্গিতটুকুও থাকেনি তাদের কথায় ব্যবহারে, শান্তিও তেমনই শুরু হয় বিনা ভূমিকায়।

হাসি আসে, মাধুর্য আসে শান্তিতে। যতটা সম্ভব। টুকিটাকি খিটিমিটিব মধ্যে যুদ্ধেব জের টেন চলবার মতো অন্ধ একগুঁয়ে তারা নয়, চাপা যখন পড়ল সংঘাত তখন তা চাপা দিয়ে রাখবাব মতো উদারতা তাদের আছে। ভালো তারা দুজনেই, মন তাদের ছোটো নয়, হৃদয় বড়ো কঠিন। কোমল অনুভূতি, ব্যাপক প্রেমভাব, মৃদুতম স্পর্শে সমবেদনার সাড়া, আধ্যাত্মিক ত্যাগপ্রেরণা, মার্জিত বিনয় ও নম্রতা, ভদ্রতা, সভ্যতা, বিদ্যা, জ্ঞান, বুদ্ধির সমাবেশ ঘটেছে তাদের মধ্যে। তারা কি পারে মিছামিছি পরস্পরকে ব্যথা দিতে ?

তবু হঠাৎ তারা মরিয়া হয়ে পরস্পরকে কুচিকুচি করে কাটে দিনে রাত্রে কয়েকবার,—তিক্ত বিস্বাদ হয়ে যায় জীবন ; দুজনেই ভাবে, এর চেয়ে মরণ ভালো।

দুজনেই ভাবে, কেন এমন হয় ? অনেক স্বপ্ন সফল হয়নি জীবনে, অনেক আশা স্বপ্ন হয়ে গেছে, অনেক বিশ্বাস ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে বাস্তবের আঘাতে—তাই বলে অমন অশান্তি, এমন তিক্ততা কেন দুর্বহ করে তুলবে তাদের জীবনকে ? যা আছে তাও তো একেবারে তুচ্ছ নয়, অকিঞ্চিৎকর নয়। হাসি ও মাধুর্যভরা নিবিড় শান্তির দু-চারঘণ্টা তো সার্থক করে রাখছে আংশিক জীবনকে—যা আছে, যা পাওয়া গেছে তারই মূল্যে। সমস্ত জীবনটা কেন অর্থহীন হয়ে গেছে ? কেন

দিবারাত্রি সুখে-দুঃখে হাসি-কান্নায় মহাশূন্যে নির্ভরহীনতার আতঙ্কের মতো এই ভয়াবহ শূন্যতাবোধ জেগে থাকছে যে, সব মিছে—এই শেষ ?

মাঝে মাঝে নিজের মনকে জবাব দিয়ে বোঝাবার জন্যই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তারা ভাবে, জীবনটাই বুঝি এমনই ছেলেখেলার ব্যাপার, বিশ্রী।

প্রতিবিধানের সাধ্যমতো চেষ্টা করে।

সিনেমায় যাবে ?

চল যাই।

বেশ কাটে কয় ঘণ্টা।

সনৎ বিশেষ করে যেতে বলেছে কিন্তু।

না গিয়ে উপায় আছে ?

বেশ কাটে কয়েক ঘণ্টা।

রবিবার ডাকলে হয় না ওদের ? নীলাকে পাওয়া যাবে গান গাইতে।

বেশ কাটে কয়েক ঘণ্টা।

মোটে বারোদিন ছুটি। তবু চলো, ঘুরে আসি। অনেকদিন বাইরে যাওয়া হয়নি।

টাকা ?

সে হয়ে যাবে।

বেশ কাটে নটা দিন দিদির বাড়িতে, পাহাড়ে, বনে, ঝরনায়। কিন্তু সে তো কতকগুলি ঘণ্টা, কয়েকটা দিন ! ঘুষ দিয়ে কি জীবনকে বাগানো যায় !

সুনীল সৌম্যেনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। মনোবিজ্ঞানে বিদেশি ডিগ্রি নিয়ে এসে দেশি কলেজে ইংরেজি সাহিত্য পড়ায়। সে বলে, না, এটা কোনো বিশেষ মানসিক রোগের লক্ষণ নয়। কী জানিস, আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের এটা বৈশিষ্ট্য। ঝগড়া করে কেঁদে কেটে আদর চায়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব মেয়ে এক রকম।

আদর চায় ? আদর ? ঝগড়া আর কাঁদাকাটার পর আদর তো তমসা পায় না, চায়ও না। কে জানে ! সৌম্যেন ভাবে, কে জানে ! ঝগড়ার পর আদর করতে যায় পরদিন তমসাকে।

এ আবার কী তামাশা ? তমসা বলে তাকে।

পাতলা কাঠির তক্তা গেঁথে, সাদা পেন্ট মাখিয়ে, দুভাগ-করা দোতলা। ও পাশের বাড়িতে নির্মল দস্তিদার থাকে। সৌমেনোর সমবয়সি, বিদ্যা মাত্র দুবার বি এ ফেলের, চাকরি অনেক নিচুস্তরের সৌম্যেনের চাকরির তুলনায়, আয়টা সামান্য কিছু বেশি উপরি নিয়ে। স্ত্রীর নাম নলিনী, বয়সে দু-তিনবছরের ছোটো হবে তমসার। রূপসি বেশিই হবে সব হিসেবে। আশ্চর্য এই, ছেলে আর মেয়ে—দুটি দুজনের প্রায় একবয়সি।

নলিনী বলে, আপনি যদি মুখ্যু হতেন দিদি আমার মতো, সই পাতাতাম আপনার সাথে।

নির্মল অতটা সরল নয়। সৌম্যেনের দাম্পত্য ব্যাপার নিয়ে সোজাসুজি উপদেশ ঝাড়বার সাহসও তার হয় না। ইশপের মতো গল্পছলে সে দাওয়াই বাতলে দেয়। একবার নয়, অনেকবার। যে কোনো প্রসঙ্গে গল্পটা টেনে আনতেও অসুবিধা হয় না, বিজ্ঞাপন-লেখকদের মতো এ বিষয়ে সে নিরঙ্কুশ একস্‌পার্ট।

বলছেন তো দিন আর এক কাপ। ওতে আর কী। দু-চারকাপ বেশি চা খাওয়া অভ্যাসও হয়ে গেছে আজকাল।···সুন্দর চা করেন আপনার স্ত্রী, ভাগ্যবান মশায় আপনি···আগে ছিল না। আগে—মানে ওই বেশি চা খাবার অভ্যাসের কথা বলছি। সকালে এক কাপ, বিকালে এক কাপ বাঁধা। এক কাপ যদি বেশি চেয়েছি কোনোদিন, সর্দিটর্দি হলে পর্যন্ত—সেকি কাণ্ড মশাই, একেবারে যেন দাঁতমুখ

খিঁচিয়ে মারতে উঠতেন। সে রণচণ্ডী মূর্তি তো দ্যাখেননি দাদা। আর শুধু কি চা এক কাপ বেশি চাইলে ? ও লেগেই আছে উঠতে বসতে, পান থেকে চুনটি খসবার জো ছিল না, দেয়াল ফাটিয়ে দিত চেঁচিয়ে।

চায়ে চুমুক দেবার আরাম ভোগ করে নিয়ে তাবপর সে শিউরে ওঠে অতীতের স্মৃতিতে, বাপ্‌স ! কী দিন গেছে ! তাবপর সে গম্ভীর হয়। সৌম্যেন জানে, গম্ভীর হযে এবার সে কী বলবে। তবু সে আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করে, অনেকবার-বলা কথাটা এবার সে কী বলে শুনবার জন্য। দোষ ছিল আমারই। বোঝার দোষ। জীবনটা তো ছিনিমিনি খেলা নয়, আপনিই বলুন দাদা ? আনো খাও, সুখ কর, তাকে কি সংসার বলে ? মানুষের আত্মা আছে, তার তো একটা অবলম্বন চাই ? নইলে শুধু খেয়ে দেয়ে ফুর্তি করাব জন্য সংসার হলে কি সুখ-শান্তি থাকে সে সংসাবে ? মনটা বিগড়ে গেল একেবারে, ভাবলাম সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাব। ভাবতে ভাবতে ধর্মে কেমন মতি হল একটু, বাড়িতেই অল্পবিস্তর চর্চা শুরু করলাম। সামান্য পুজো-আচ্চা জপতপ, সংসারে কী বলে গিয়ে তাই যথেষ্ট। বলব কী আপনাকে, সংসাবের চেহারা যেন আমার বদলে গেল দুদিনে। জড়ি শিকড় ছোঁযালে সাপ যেমন মিইয়ে যায়, উনি ঠিক তেমনই ঠান্ডা ভালোমানুষ হয়ে গেলেন। সত্যি কথা দাদা, কুঁদুলে মেয়েমানুষ হল সাপের মতো, ধম্মোকম্মো ছাড়া তাদের বশ করার উপায় নেই। এখন দেখুন না, দশ কাপ চা চাইলে বানিয়ে দেবে ঠিক, কথাটি কইবে না।

সৌম্যেন তমসার কাছে গিয়ে বলে, ধর্মে তো আমরা বিশ্বাস করিই, ধর্মের কর্তাবা যাই বলুন আমাদের একেলেদের সম্বন্ধে। ধর্মকর্মে আমাদের অবিশ্বাস নেই, কী কবে ধর্মকর্ম কবব তাই জানিনে বলে মুশকিল।

কিন্তু আজ ধর্মের কথা কেন ? সন্ন্যাসী হবে নাকি ? তমসা জিজ্ঞাসা কবে।

ইচ্ছা হয়।

তা হবে না ? চাকরি করা সংসার কবার কত কষ্ট !

দুজনের বেধে যায়, কুচিকুচি কবে কাটে তারা পরস্পরকে। কাঠের দেযালেব ফাঁক ফোকব দিয়ে ঘরে সঞ্চারিত হয় ধূপের মৃদু গন্ধ। নলিনী ফুল-জল দিচ্ছে পটের দেবতাকে, স্নান কবে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে।

নির্মলের পাঁচ বছরের মেয়ে মণি প্রসাদ এনে দিয়ে তাদের থামায। কয়েকটি বাতাসা, কযেক টুকরো শশা ও কয়েক কোয়া কমলা। ছোটো রেকাবিটিতে ছিটেফোঁটা চন্দনের গন্ধ। দুজনে তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

নির্মলদের সঙ্গে আত্মীয়তার যে অনুভূতি গড়ে উঠছিল সেটা আবার নতুন করে স্পষ্ট অনুভব করে দুজনেই। সেই সঙ্গে নিজেদের মনে হয় বড়ো নিরুপায়।

পাতলা কাঠের পার্টিশন। একটা ফাঁকের কাছে এসে নলিনী বলে, একটা কথা শুনবেন দিদি ? পুজো-আচ্চা ধম্মেকম্মে একটু মন দিন। আপনি মন দিলে, ওনারও মন আসবে। দুজনে শান্তি পাবেন। আমাদের লাগত না আগে ? চুলোচুলি কাণ্ড হত না ? পট আনিয়ে নিত্যি পুজো করি— পুজো মানে ওই দুটো ফুল আর জল দেয়া আর কী ! চানটান করে শুদ্ধ হয়ে মনটা ঠিক করে নিয়ে কোনোদিন ওনাকে দিয়ে করাই। আর ছোটোখাটো নিয়মনীতি পালন করি। উনি যেন বদলে গেছেন, একেবারে নতুন মানুষ। রাগারাগি করেন না বললে হয়।

বলে সে সরল ভাবেই, হৃদ্যতার সঙ্গে। তবু একটু ঈর্ষা ও ব্যঙ্গের ভাব উঁকি মারে অন্তরাল থেকে। বসে গল্প করে সুখদুঃখের, মোটা গয়নার মতো মোটা সুখের, মাটিতে চেপে বসার মতো মোটা দুঃখের। জ্বালাতন পোড়াতন হয়ে গেল সে সংসারে। বিশ্রাম নেই, বিরাম নেই, আরাম নেই, শান্তি নেই। তবে মেয়েমানুষের আর কী চাই। এতেই মেয়েমানুষ ধন্য। স্বামীপুত্র রেখে যেতে পারলেই হয়।

জ্বালাতন পোড়াতন কীসে হলেন তবে ?

ওমা ! সামলাতে হয় না সব ? আপনি হন না ? অত লাগেন কেন কত্তার সঙ্গে তবে ?

নির্মলেরাও ছুটিতে বেড়াতে যায়। দেশের বাড়িতে যুদ্ধের ক-বছরও নিয়মিত গিয়েছে, এবারও যাবে। তার দেশের পথে এক ট্রেনে একই দিনে দূরবর্তী স্বাস্থ্যনিবাসের উদ্দেশে সৌম্যেনেরা রওনা হবে শুনে নির্মল দারুণ খুশি আর উৎসাহিত হয়ে উঠল।

আপনাদের নামতে হবে, দুটো দিন থেকে যেতে হবে আমাদের বাড়িতে। কোনো হাঙ্গামা নেই, স্টেশনে নামবেন, আবার স্টেশন থেকে গাড়িতে উঠবেন। দুটো দিন কষ্ট করবেন।

বাড়িতে তার গাই বিইয়েছে। ক-মাস খাঁটি দুধ খাওয়াবে। যুদ্ধ শেষ হলেও দেশের অবস্থা খারাপ বটে, তাই বলে টাটকা মাছ তরকারি কী আর অতিথিকে সে খাওয়াতে পাববে না অল্পবিস্তর দুটো দিন। স্টেশন থেকে মোটে চার মাইল, ঘোড়াব গাড়ি পাওযা যায়। কোনো কষ্ট হবে না। স্টেশনমাস্টার আবার নির্মলের নিজের বোনাই। দরকার হলে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখবে আধঘণ্টা, ভিড় হলে শোয়ার জায়গা করে দেবে। এ সুযোগে দেশেব বাড়িতে পায়ের ধুলো একবার না দিলে সৌম্যেনদের সে ছাড়বে না।

ওদের এত উৎসাহের মানে ভালো বোঝে না, কিন্তু তাদের দুদিন অতিথি পাবার জন্য ওদের আগ্রহ প্রায় মুগ্ধ কবে দেয় সৌম্যেন আব তমসাকে। ট্রেনে খানিকটা মানে বোঝা যায়।

সদরের ম্যাজিস্ট্রেট মুখার্জি সায়েবকে তো আপনি চেনেন ? নির্মল বলে কথায় কথায়।

জানা শোনা ছিল।

কাল আসবেন আমাদেব গাঁযের স্কুল দেখতে। দেখা হবে আপনার সঙ্গে। নির্মল বলে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে।

ওব কাছে আপনার কি কোনো দরকাব— ? সৌম্যেন বলে, ফাঁদেব সন্দেহে বিব্রত হয়ে।

আবে রাম রাম। সোজা হয়ে উঠে বসে নির্মল। ও সব ভাববেন না। সভাটভা হবে, উনি আসবেন, দেখাসাক্ষাৎ হবে আপনার সঙ্গে, তাই বলছি। আমি কমিটিতে আছি কিনা। স্কুলের গ্র্যান্টটা কিছু বাড়াতে অনুরোধ করা হবে।

মানে খানিকটা বোঝা গেলেও তাতে নিমন্ত্রণের আন্তরিকতায় খুব বেশি সন্দেহ হয় না। ছাঁচে ঢালাই মানুষ নির্মল, কিন্তু লোক খারাপ নয়।

ভোরে তারা নামে। স্থানটি ছোটো, তার তুলনায় স্টেশনটি সত্যই খুব বড়ো। নির্মলেব নিজেব বোনাই স্টেশনমাস্টারটিকে খোঁজাখুঁজি করেও না পাওযায় নির্মল রীতিমতো ক্ষুব্ধ ও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তাব এ অপমানে যেন খুশি হযেই নলিনী বলে, তোমারই তো বোনাই !

স্টেশন থেকে লাইনের পাশাপাশি বাঁধানো লাল রাস্তা গেছে অনেক দূর, রোগা ঘোড়া দুটি টকর টকর করে গাড়ি টেনে চলে। সকালের শান্ত রোদে এদিকে রেলের লাইন আর ওদিকে খেত মাঠ, ছাড়া ছাড়া ঘরবাড়ি ও অস্থায়ী খড়ের ছাউনি দেখতে বেশ ভালো লাগে। সামনে কিছু দূরে চোখ পড়ে কারখানার উঁচু চোঙা।

আমাদের গাঁয়ের জমিদার রামপ্রাণ চৌধুরী, তার মিল। মিলে কী সব হাঙ্গামা চলছে শুনছিলাম।

পথ দক্ষিণে বেঁকে গেছে মিলের গেটের সামনে দিয়ে। কাছাকাছি গিয়ে তাদের ঘোড়ার গাড়িকে থামাতে হয়। মিলের গেটের দিকে মুখ করে পাশাপাশি রাস্তা বন্ধ করে আছে একটা লরি, থেকে থেকে গর্জন করে উঠছে ইঞ্জিন, কিন্তু এগোতে পারছে না। লরির সামনে থেকে গেট পর্যন্ত গাদাগাদি করে শুয়ে আছে মানুষ। পুরুষ ও নারী। চারিদিকে ভিড় করে আছে আরও অনেক লোক।

নির্মল দেখিয়ে দিল, উনি চৌধুরী মশায়।

খদ্দরের কোট গায়ে মোটা ভুঁড়িওলা মানুষটি, হাতে দামি কাঠের মোটা লাঠি। দুপাশে ও পিছনে তার সাঙ্গোপাঙ্গের সঙ্গে ডজন খানেক পুলিশ। থেকে থেকে চৌধুরী গর্জন করছে : চালাও চালাও উপরসে চালাও। চাপা দে দেও শালা লোককো !

লরির ইঞ্জিন গর্জন করে উঠছে। লরির এক হাত সামনের শায়িত মানুষ একটু নড়ছে না। ইঞ্জিনের গর্জন কমে যাচ্ছে। গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে সৌম্যেন আর তমসা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। তমসার ছোটো ছেলেটা কাঁদে, নলিনী তাকে থামাতে চেষ্টা করে, তমসার খেয়ালও থাকে না। তখন হঠাৎ পরিবর্তন ঘটে অবস্থার। ইঞ্জিন একেবারে থামিয়ে দিয়ে লরির ড্রাইভার নীচে নেমে আসে।

নামলি যে হারামজাদা ? রামপ্রাণ গর্জে ওঠে।

আমি পারব না। আপনি চালান।

রামপ্রাণের প্রাণে বোধ হয় আর সয় না। অকথ্য একটা কথা বলে সে হাতের লাঠি বসিয়ে দেয় লরি-চালকের মাথায়। সে ঘুরে পড়ে গেলে তার দিকে এক নজর না তাকিয়েই এগিয়ে গিয়ে রামপ্রাণ আথালিপাথালি পিটতে থাকে শায়িত পুরুষ ও মেয়েদের।

তমসার মাথাটা বোধ হয় বিগড়ে যায় দেখে। মুখে চেঁচায়, এ কী ! এ কী ! কাজ করে আবও অদ্ভুত। ঘোড়ার গাড়ির দরজা খুলে তড়াক করে নেমে ছুটে গিয়ে দুই হাতে জড়িযে ধরে রামপ্রাণেব মোটা শরীরটা।

কী করছেন আপনি ?

নিজেকে মুক্ত করে রামপ্রাণ বলে, তুমিই বুঝি সরোজিনী ?

না। আপনি মানুষ না পশু ?

সৌম্যেন লরি চালকের মাথায় রুমাল চেপে ধরেছিল। সে ডেকে বলে, শুনছ ? ছোটো সুটকেসে ছেঁড়া কাপড় আছে আমার, খানিকটা ন্যাকড়া ছিঁড়ে আনো তো।

বিকালে স্কুলের সভায় সৌম্যেনের যাওয়া হয় না। রামপ্রাণ চৌধুরীর মিলেব অদূরে প্রতিবাদ সভা হবে, গাঁয়ের অর্ধেক লোক সেখানে ছোটে। সৌম্যেনও যায়।

বড়ো ছেলেটাকে নলিনীর কাছে রেখে ছোটো ছেলেকে কোলে নিয়ে তমসাও সঙ্গে যায় সৌম্যেনের।

শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরেও তারা রাত জেগে কথা বলে। পরের বাড়ির নতুন আবেষ্টনীতে যেন নতুন করে তাদের বিয়ে হয়েছে। সুখদুঃখের কথাই বলে। নিজের নিজের নয়, অনেকের সুখদুঃখের কথা।

# দেবতা

পদস্থ ও বয়স্ক ধীর স্থির গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন ব্রজদুর্লভবাবু। চেহারাটা ছিল জমকালো। চ্যাপটা ধরনের নয় গোলাকার। সম্ভবত সেই জন্যই মেরুদণ্ডটা ভদ্রলোকের সব সময় সোজা হয়ে থাকত। মনের জোরের বদলে এই কারণে মেরুদণ্ডটা সোজা হয়ে থাকত বলেই বোধ হয় তার অপরিমেয় তেজ ও সাহস ছিল পাথরের কামানের মতো নম্র। হাকিমি পদগৌরব আর কীর্তনের আসর জমাবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছাড়া কোনো বিষয়ে অহংকার করার কিছু না থাকায়, বিনয়ের তার একেবারেই প্রয়োজন ছিল না। তবু পুরুষোচিত বিনয় বজায় রাখবার জন্য পদগৌরবটা ভদ্রলোক প্রকাশ করতেন পাণ্ডিত্যে আর কীর্তনের অসাধারণ ক্ষমতাটা প্রকাশ করতেন কেবল কীর্তনে। পাণ্ডিত্যের বিশেষ অভাব থাকায় মানুষের সভয় শ্রদ্ধাটা তার ভালোরকমই জুটত, কীর্তন গেয়ে মানুষকে ভাবোন্মাদ করে দেবার বিশেষ প্রতিভা থাকায় মানুষের হৃদয়ে তার জন্য বয়ে যেত সানুরাগ ভক্তির বন্যা।

কী যে হয়ে যেতেন তিনি কীর্তনের আসরে ! গায়ে দামি মুগার জামা থাকত, তবু দীনহীন কাঙালের মতো একবার, শুধু একটিবার, চিরন্তন প্রেমময়ের অফুরন্ত প্রেমের ভান্ডার থেকে এক কণা প্রেম ভিক্ষা করতেন, তখন মনে হত এত বড়ো কাঙাল কি জগতে কেউ আছে ! চাকর আসরে তামাক দিতে এসেছে, তার গলা জড়িয়ে ধরে তিনি কাঁদতেন। আধা-অন্তরালবর্তিনী মেয়েদের অনেকের চোখ দিয়ে ভাবাবেগে জল পড়ছে, আনন্দে গদগদ হয়ে তিনি নাচতেন। নিজের মধুর ও গম্ভীর গলার আওয়াজ একটু ধরে এসেছে, আবেগে গড়াগড়ি দিয়ে তিনি ছটফট করতেন। রাত্রি বেশি হয়ে পড়ায় উপস্থিত ভদ্রলোকের মধ্যে কেউ কেউ উঠি উঠি করছেন, বারকয়েক হুংকার দিয়ে নির্বাক নিস্পন্দ সমাধিমগ্ন হয়ে তিনি পড়ে থাকতেন।

আসর বসত প্রায়ই। সাধারণত শনিবার সন্ধ্যায়, অথবা অন্তত একটা দিনও ছুটি হাতে থাকে এমন কোনো দিনে। কীর্তনের শ্রান্তি দূর করবার জন্য ব্রজদুর্লভবাবুর কমপক্ষে একটা দিনের পরিপূর্ণ বিশ্রাম অথবা কমবয়সি ( সম্ভবত দ্বিতীয় পক্ষের, ঠিক মনে নেই ) স্ত্রীর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন পার্থিব প্রেমালাপের প্রয়োজন হত। তবে মোটে এক দিনের ছুটি থাকলে বেশি শ্রান্তি তিনি অর্জন করতেন না, রাত বারোটার আগেই কীর্তন শেষ করে দিতেন। রাত কাবার করতেন লম্বা ছুটির গোড়ায়, মনে হত যে উৎসব উপলক্ষে ছুটি সেই উৎসবই তার মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করেছে।

মফস্‌সলের হতভাগা শহর, সিনেমা নেই, থিয়েটার নেই, ভদ্রলোকের উপযুক্ত অভদ্র স্ত্রীলোকের পল্লি নেই, গোটা তিন চারেক মুমূর্ষু সমিতি ছাড়া জবরদস্ত সমিতি নেই, জোরালো রাজনৈতিক আন্দোলন নেই, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামাও নেই,—থাকার মধ্যে আছে কেবল একটা ক্লাব আর লাইব্রেরি। ব্রজদুর্লভবাবুকে পেয়ে শহরটা যেন বর্তে গিয়েছিল। নিজের বাড়িতে কীর্তনের আসর বসাবার প্রয়োজন ভদ্রলোকের হত না। জীবনের অব্যক্ত অংশের পীড়ন থেকে মুক্তিকামী নরনারীকে উন্মাদনা জোগাতেন তিনি পরের বাড়ি। বাড়ি থেকে তাঁকে নিয়ে আসবার এবং বাড়িতে পৌঁছে দেবার গাড়ি জোগান, আসরের শতরঞ্চি ফরাশ আলো এবং দরকার হলে শামিয়ানা ও শখ হলে আসরকে সাজসজ্জা দান করা, বাজারে ঢুকবার পথে প্রথম মুদি দোকানটির মালিক রাধাচরণ বসাক নামে যে ব্যক্তিটি খোলকে প্রায় কথা বলাতে পারে তাকে সংগ্রহ করে আনা, শহরের কীর্তন বিশারদ ও কীর্তন রসজ্ঞদের সমবেত করা, উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে মাঝে মাঝে পান তামাক আর

দেবতা
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবতা গল্পের পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা

শীতল পানীয়জল সরবরাহ কবা, এই সব ব্যবস্থা করে ব্রজদুর্লভবাবুর কৃপায় রোমাঞ্চ, শিহরন আবেগ, উন্মাদনা প্রভৃতি লাভ করার জন্য শহরের অনেকেই উৎসুক হয়ে থাকতেন।

বেশি উৎসুক ছিলেন স্থানীয় রাজা-জমিদার মুরারীমোহন। প্রথম বয়সে নাট্যচর্চার উৎসাহে তিনি একটি স্থায়ী স্টেজ নির্মাণ করেছিলেন। জীবনের অলস অনাড়ম্বর গতিতে অসন্তুষ্ট এই শহরের এই অপ্রধান শহরে ব্রজদুর্লভবাবু সুলভ হওয়াব অনেক আগে স্টেজে অভিনয় রজনির সংখ্যা কমতে কমতে বছরে বার তিনেকে এসে ঠেকেছিল। মাসে চার-পাঁচবার ব্রজদুর্লভবাবুব কীর্তন আরম্ভ হওয়ার পর পূজার সময় কেবল একদিন একটি মাত্র ছোটো ভক্তিমূলক নাটকের অভিনয় হত। প্রহসন পর্যন্ত বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

শহরবাসীর সকাতর অনুবোধে কত কষ্টেই যে ব্রজদুর্লভবাবু তিন-তিনবার নিজের বদলি রদ করেছিলেন।

ক্যানেলের ধারে ব্রজদুর্লভবাবুর বাড়িখানা ছিল লোভনীয়। লাল রং করা মাঝারি আকারের সাধাবণ দোতালা বাড়ি, রঙের আবরণ ছাড়া কিছুই হয়তো নতুন ছিল না, শোভার হিসাবে চারিদিকে প্রকৃতিও ছিল রিক্ত, তবু কামুক যুবকের কাছে প্রতিবেশীর অনাদৃতা পত্নীর মতো কী আশ্চর্য মনোরমই বাড়িটা ছিল ! ক্যানেলের স্রোতহীন স্বচ্ছ নীল জলের ওপারে প্রকাণ্ড অপরিচ্ছন্ন আমবাগান, যার পিছনে আজও সূর্য অস্ত যায়। পুবদিকে খানিক দূরে পাকা রাজপথ, যা থেকে একটা কাঁচাপাকা পথ এ বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। শাখা পথটির দক্ষিণে প্রকাণ্ড দিঘি, উত্তবে ছেলেদের ফুটবল খেলাব মাঠ। দিঘিব দক্ষিণে স্কুল। ব্রজদুর্লভবাবুব বাড়িব ছাতে উঠলে দেখা যায স্কুলেরও ওদিকে অনেকগুলি এলোমেলোভাবে ছড়ানো বাড়ি পার হয়ে বাজপথ মোড় ঘুরে পুলের ওপর দিযে ক্যানেল ডিঙিয়ে শহরের আরও জমাটবাঁধা অংশে প্রবেশ করে হাবিয়ে গেছে। যদি কারও জীবনে কোনোদিন কোনো প্রিয়জন নিরুদ্দেশ যাত্রা করে থাকে, ব্রজদুর্লভবাবুর বাড়িব ছাতে উঠে পুল ডিঙিয়ে রাজপথটির শহরেব ঘনীভূত অঞ্চলে ঢুকে নিরুদ্দেশ হবাব রকম দেখলে তাব মনে হবেই, এও একটা নিরুদ্দেশ হবার পথ।

তিনবার বদলি হবার সম্ভাবনা ঘটলে ব্রজদুর্লভবাবুর স্ত্রী, যার নাম সম্ভবত ছিল মাধবী, খোনা গলায় বলেছিলেন, ওরে বাবারে গলায় দড়ি দিয়ে মরব নাকি আমি ! এই সেদিন এসে গোছগাছ করে বসলাম এখেনে, দুদিন যেতে না যেতে বদলি ! যেতে হলে তুমি যাও, আমি যাব না।

সেটা সম্ভব নয়। তাই কত কষ্টেই যে ব্রজদুর্লভবাবু তিন-তিনবাব নিজের বদলি রদ করেছিলেন।

সহজ বিষয়কে কঠিন করার সবচেয়ে সহজ উপায় মাঝে মাঝে ধারাবাহিকতার খানিক খানিক গাপ করে ফেলা ! রামকে ইজিচেয়ারে শুইয়ে সিগারেট টানাবার পর ইন্দ্রেব সভায় আসব পান করালে, দশবছর সময় আর রক্তের চাপে রামের মৃত্যুকে যে চুরি করেছে পরম রহস্য-স্রষ্টা বলে সেই চোরের পায়ে মানুষ শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়। নিজের জীবনের ধারাবাহিকতার ছোটোবড়ো অংশ ক্রমাগত পরকে দান করে করে মানুষের আজ এই দশা হয়েছে। তাই শেষবার বদলি রদ করতে হওয়ার রাগে সাতদিনের ছুটি নিয়ে পরপর তিনরাত্রি ভদ্রলোক কীর্তন করেছিলেন।

মাধবীর কীর্তন-শ্রান্ত স্বামীর সেবার তুলনা জগতে আছে কিনা সন্দেহ। স্বামী যেন স্বামী এবং পুত্র এবং পর এবং অতিথি—একাধারে সব। ব্রজদুর্লভবাবুর কীর্তন শুনে সকলের যে রোমাঞ্চ হত, মাধবীর খোনা গলায় একটি মাত্র মধুর সম্ভাষণেই ব্রজদুর্লভবাবুর তার চেয়েও গুরুতর রোমাঞ্চ হওয়া অসম্ভব ছিল না। মানুষ ব্রজদুর্লভবাবু যেতেন কীর্তনের আসরে, নিজে পাগল হয়ে সকলকে করে

দিতেন পাগল, নিজের অলৌকিক পরিণতির সঞ্চয় নিয়ে তিনি যখন বাড়ি ফিরতেন মাধবীর পূজা পাবার জন্য তখন হয়ে যেতেন দেবতা।

অন্তত আমার যে নিঃশব্দ পূজা নিয়ে তিনি বাড়ি যেতেন, দেবতা ছাড়া আর কারও তা প্রাপ্য নয়।

আসরে যেতাম সকলের আগে। বাড়িব দিকে পা বাড়াতাম ব্রজদুর্লভবাবু গাড়িতে উঠে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসবাব পর গাড়ি যখন চলতে আবম্ভ করত। একবার শেষ চোখাচোখি হওয়ার সাধ কোনোদিন আমার মিটত, কোনোদিন মিটত না।

কীর্তন শুনতে শুনতে বুকফাটা বিহ্বলতায় যে চোখ দিয়ে আমার জল পড়ত, সবদিন সে চোখেব দিকে তাকিয়েও যেতেন না, এমনই নিষ্ঠুর ছিলেন ব্রজদুর্লভবাবু। স্বাধীন স্বাভাবিক চোখে তখনও আমার চশমা ওঠেনি, চোখের জল ভদ্রলোকের দৃষ্টিতে না পড়ার তো কোনো কাবণ ছিল না।

আসরে বড়োর মধ্যে আমি ছোটো, চুপ করে বসে থাকা ছাড়া সব বিষয়েই অনধিকারী। কীর্তন আরম্ভ হলে আমার ভাবান্তর হবে আমি তা জানতাম। তাই প্রথম থেকে হয়ে থাকতাম নির্বাক নিঃশব্দ সুশীল সুবোধ বালক, কেবল ভাবের অভিব্যক্তিতে একটু চঞ্চল। তবু মাঝে মাঝে কেন যে আমাকে শুনতে হত, গোলমাল কোরো না খোকা, আজও তা বুঝতে পারি না। তবে তাতে আমার ক্ষতি ছিল না। এত বড়ো হৃদয ছিল তখন যে ব্রজদুর্লভবাবু যা পরিবেশন করতেন তার সঙ্গে এ সব কথা শোনাব অভিমানেরও হৃদয়ে স্থান হত।

গুরুজন বলতেন, অনেক রাত হয়ে গেছে, চল এবার বাড়ি যাই। ঠোঁট কামড়ে অসম্মতি জানাতাম। ঠোঁট কামড়াতাম কথা বলতে পারতাম না বলে। গুরুজন শঙ্কামিশ্রিত চিন্তাকুল দৃষ্টিতে আমাকে দেখতেন।

বাড়ি ফেরার পথে শুনতাম, লেখাপড়া ফেলে এ সব করলেই তোর দিন যাবে ?

কে সে কথার জবাব দেবে ? দিন তো চলে গিয়েছে কখন ! গাছের আড়ালে ক্ষীণাঙ্গী চাঁদ। পাতা আর ডালের ফাঁকে ফাঁকে আলোর বিন্যাসেব সঙ্গে ছাযাব যোগাযোগ ঘটিযে ইচ্ছামতো মূর্তিকে রূপ দেওয়া যায়।

জিজ্ঞাসা করতাম, কেঁদে কেঁদে দেখতে চাইলে দেখা দেন, না ? কত কাঁদতে হয় ? অনেক ? গুরুজন বলতেন, চল, জোরে হাঁট।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে আলোচনা শুনতাম, আমার এই অদ্ভুত পরিবর্তনের সম্বন্ধে। এই বযসে এ রকম পাগলামি আমার অকল্যাণ ঘটাতে পারে ভেবে আমার আপনজনের আশঙ্কায় আমাকে আশ্চর্য কবে দিত। আমাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেবার জল্পনা-কল্পনা শুনতে শুনতে ঘুমের ভান কখন আসল ঘুমে পরিণত হয়ে যেত, স্বপ্ন দেখতাম আমার জাগ্রত কল্পনার তপ্তকাঞ্চনাভ বিরাট এক পুরুষের অবিভক্ত অস্তিত্বের এবং আমার প্রতিবেশিনী সখী রেণুর সবচেয়ে ছোটো পুতুলটির মতো শুভ্রকায় বিন্দুবৎ ক্ষুদ্র এক পুরুষের সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট অস্তিত্বের কী ভাবে দুটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না হওয়া সম্ভব। চারিদিকে অসংখ্য ব্রজদুর্লভ পলকে পলকে মাধবী হয়ে যাচ্ছে অথবা অসংখ্য মাধবী পলকে পলকে ব্রজদুর্লভ হয়ে যাচ্ছে, স্বপ্নে এ সব ঘোরপ্যাঁচ আমায় পীড়া দিত না। ধারাবাহিকতার ফাঁদ এড়িয়ে অনায়াসে ভিজা মাঠে ভিজা ফুটবল শুট করে গোলের দিকে পাঠিয়ে দিতাম, পরক্ষণে নিজে চলে যেতাম উলঙ্গিনি মাধবীর কাছে।

মাধবীর কাছে যেতাম, সকালে ঘুম ভেঙে নয়, স্কুল পালিয়ে।

দোতালার একটা ঘরের কোণে ছোটো একটি কাঠের বেদিতে কোনো একজন দেবতার পট, তার সামনে ছোটো দুটি রেকাবিতে ফলমূল বাতাসার নৈবেদ্য সাজিয়ে মাধবী পূজায় বসেছে। বিড় বিড় করে কী মন্ত্র বলছে সেই জানে।

আমাকে দেখেই বলত, মহারাজ এসেছেন ? আসুন, বসুন।

কীর্তনের আসরে যার জন্য ব্রজদুর্লভবাবু পাগল হয়ে যেতেন তাকে পাওয়া যায় কিনা, কী করলে পাওয়া যায়, দিনরাত মনের মধ্যে এই প্রশ্ন গুমরে বেড়াত ! ব্রজদুর্লভবাবুকে জিজ্ঞাসা করব ভেবেই তাদের বাড়ি যেতাম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করার সাহস হত না। ভাবতাম মাধবীর কাছে প্রশ্নের জবাব জেনে নেব, পূজারতা মাধবীর ফাজলামিতে সে ইচ্ছাও লোপ পেয়ে যেত। ম্লান মুখে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে পটের অজানা দেবতার মধ্যে আমার কল্পনার মহান সুন্দর প্রেমময় দিব্য পুরুষকে প্রণাম করে নীরবে মাটিতেই বসতাম।

পূজা সাঙ্গ করে মাধবী আমাকে প্রসাদ দিত। দুহাত পেতে প্রসাদ নিতাম, সসম্ভ্রমে কপালে ঠেকিয়ে মুখে দিতাম। শশার টুকরোটি লাগত তিতো। কিন্তু ঠাকুরের প্রসাদ তো তিতো লাগলে চলবে না। অমৃতের মতো মধুর লাগছে মনে করবার চেষ্টা করতে করতে তিতো শশা গিলে ফেলতাম।

মাধবী শশার টুকরোতে কামড় দিয়ে বলত, কী তিতো মাগো !

বলে, খোলা দরজা দিয়ে বারান্দা ডিঙিয়ে শশার টুকরোটি ছুঁড়ে ফেলে দিত উঠানে।

আমি স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম, ভাবতাম, এমন অবহেলার সঙ্গে এত বড়ো পাপ সঞ্চয় করবার সাহস সে পেল কোথায় ? ঠাকুরের প্রসাদ মুখে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল !

প্রসাদ ফেলে দিলেন ?

বড়ো তিতো ! এক একটা শশা এমনই হয়ে যায়।

একটি দুটি করে বাতাসা মুখে দিত মাধবী, জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকত ক্যানেলের জলের দিকে।

পায়ে পায়ে নীচে যেতাম অপরাধীর মতো, আমার চোখের সামনে প্রসাদ ছুঁড়ে ফেলে মাধবী যে দেবতাকে অপমান করেছে সে দায়িত্ব যেন আমার। উঠানে নেমে দেখতাম, উঠানের একদিকে নর্দমার কাছে যেখানে আবর্জনা জমা করা হয় সেইখানে মাধবীর চিবানো শশাটুকু পড়ে আছে। হাতখানেক তফাতে একটা কেন্নু হেঁটে চলেছিল, মৃদু মন্থর গতি। দেয়ালে ঠেসান দিয়ে রাখা নর্দমা সাফ করার ঝাঁটাটি ক্ষয়ে ক্ষয়ে অর্ধেকের চেয়েও কমে গেছে। এত ঝাঁটানো সত্ত্বেও সেখান থেকে কিন্তু শ্যাওলা লোপ পায়নি। সেদিন সকালেই হয়তো সেখানটা সাফ করা হয়েছিল, তারপর হয়তো কেটেছিল মোটে কয়েকটি ঘণ্টা সময়, তারই মধ্যে এই ছোটোখাটো সংসারটির কত নোংরামিই যে সেখানে জমেছে ! বুকে বল সঞ্চয় করবার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে একবার দেবতার ইঙ্গিত খুঁজেছিলাম, চারিদিকে তাকিয়ে একবার দেখেছিলাম মানুষ আমাকে দেখেছে কিনা, তারপর পানের পিক থেকে তুলে নিয়েছিলাম সেই চিবানো শশা। মাধবীর হয়ে মনে মনে বলেছিলাম, অপরাধ নিয়ো না। কপালে ঠেকিয়ে শশাটুকু মুখে দিয়ে গিলে ফেলেছিলাম।

বমি আসছিল এ কথা সত্য, কিন্তু মনের জোরে বমি ঠেকানো কঠিন নয়।

# ভয়ংকর

বিশ্বম্ভব গদিতে বসে তামাক টানছে, আশেপাশে প্রসাদ ও অন্যান্য কর্মচারী। তামাক টানতে টানতে বিশ্বম্ভবেব কাশি, সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদও খক্ খক্ কবে কাশতে আবম্ভ কবল। পবে বিশ্বম্ভরেব কাশি থেমে গেল কিন্তু প্রসাদের কাশি আর থামে না। তখন—

**বিশ্বম্ভব** : [*ধমকে*] প্রসাদ !

**প্রসাদ** : [*কাশি থামাতে পাবলে না*]

**বিশ্ব** : [*আবও জোবে*] প্রসাদ—!

**প্রসাদ** : [*কাশি চাপতে চাপতে*] আ-জ্ঞে—!

**বিশ্ব** : বলি তোমার ব্যাপারটা কী হে প্রসাদ ? আমি কাশলে তোমাব কাশি পায কেন ?

**গজেন** : বেযাদপি বাবা—স্রেফ ছোঁড়ার বেযাদপি। শুধু কাশলে কেন, তুমি হাসলেও ওব হাসি পায।—ভগবান না করুন, তুমি যদি কখনও কাঁদো—

**বিশ্ব** : [*উচ্চহাসি*] হাঃ—হাঃ—হাঃ—কাঁদব কেন মামা !

**গজেন** : বালাই ! কাঁদবে কেন ?

**বিশ্ব** : তোমাব কিন্তু এ ভারী বিশ্রী স্বভাব প্রসাদ ! তামাক টানতে গিযে আমি দুবাব কাশলুম, তুমিও অমনি কাশতে কাশতে মববাব দাখিল হলে !

**প্রসাদ** : না বাবু, তা নয—

**বিশ্ব** : ইস, মুখখান যে টুকটুকে লাল হযে উঠল !

**গজেন** : আর বল কেন বাবা, ছোঁড়া কথায কথায মেযেলোকেব মতো লালচে মেবে যায়। ও যদি মেযেলোক হত—

**বিশ্ব** : প্রসাদ যদি মেযেলোক হত ! হাঃ—হাঃ—হাঃ— হাঃ—

[*উচ্চহাসি, সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদও হাসতে থাকবে। বিশ্বম্ভবেব হাসি থেমে গেলেও প্রসাদেব হাসি থামবে না*]

**বিশ্ব** : প্রসাদ !

**প্রসাদ** : [*হাসি চলতে থাকবে*]

**বিশ্ব** : [*ধমকে*] প্রসাদ !

**প্রসাদ** : [*আচমকা হাসি থামিযে*] আ জ্ঞে !

**বিশ্ব** : ফের যদি এ রকম বেযাদপি কববে প্রসাদ --

**প্রসাদ** : [*কাতব ভাবে*] আজ্ঞে বেয়াদপি নয বাবু।

**বিশ্ব** : কী তবে ? মাথায ছিট আছে ?

**প্রসাদ** : না বাবু।

**বিশ্ব** : কাঁপছ কেন ? জ্বব আসছে ?

**প্রসাদ** : আজ্ঞে না তো !

**বিশ্ব** : তবে ?—মুখখানা ফের দেখছি কাগজের মতো সাদাটে বনে গেছে। গায়ে কি তোমার রক্ত নেই ?

প্রসাদ আজ্ঞে- ছেলেবেলা থেকে নানারকম অসুখে ভুগছি-

বিশ্ব কী অসুখ ? সাত বছর আমার কাছে আছ, তেমন কোনো অসুখ বিসুখ হতে তো কখনও দেখিনি।

প্রসাদ আছে বাবু, ভেতরে ভেতরে আছে।

বিশ্ব ছাই আছে। রোগীর মতো রোগা চেহারা তোমার নয়।

প্রসাদ কিছু নেই বাবু দেহে। দিনরাত বনবন করে মাথা ঘোরে, বুক ধড়ফড় করে। নিয়ম মেনে সাবধানে চলি বলে কোনোমতে টিকে আছি। একদিন যদি বিষ্টিতে ভিজি, সর্দি কাশি নিম্যুনিয়া হয়ে মরে যাব।

বিশ্ব তোমার মরাই ভালো

গজেন মরেই তো আছে বাবাজি।

বিশ্ব যাই হোক, কারখানায় টাকাটা আগে পৌঁছে দিয়ে মরো বাঁচো যা খুশি করো। আজ মাইনে না দিলে কাল কেউ কাজে আসবে না বলেছে। ব্যাটাদের আস্পদ্দা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আবার আইন দেখায়—আমি বিশ্বম্ভর শর্মা, বামুনের ছেলে হয়ে চামড়ার কারখানা খুলেছি, আমায় আইন দেখায়! কোনো ব্যাটাকে আমি ডরাই। থাকগে দেব বলেছি আজকে, তাই পাঠাচ্ছি,- নইলে একবার দেখে নিতাম ব্যাটারা কী করে।— হ্যাঁ ঠিক আছে মামা ?

গজেন ঠিক আছে বাবাজি। ন শো তেইশ টাকা পাঁচ আনা তিন পাই।

বিশ্ব কামাই কেটেছ সব ?

গজেন হ্যাঁ—।

বিশ্ব আচ্ছা তবে প্রসাদকে হিসেবের কাগজটা দাও। বেলাবেলি চলে যাও প্রসাদ। বৈশাখ মাস - ঝড় টড় উঠতে পারে। আমি ঘরে গিয়ে টাকা বার করে রাখছি।

প্রসাদ যে আজ্ঞে।

বিশ্ব মামা, তুমিও বেরোও। আড়তে গিয়ে বংশীকে বোলো, বাতের চালানটা যতক্ষণ না আসে আড়তে জেগে বসে থাকতে হবে, লোকজন নিয়ে। দরকার হলে সমস্ত রাত। হ্যাঁ—আর একটা কাজ করো মামা। আসবার সময়ে দুটো বোতল নিয়ে এসো।

গজেন একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না বাবা ? কদিন উপরো উপরি একটানা চলছে—

বিশ্ব তোমার ভাগনে বউ আজ মাংস রাধছেন কোর্মা। বলেছেন পেট ভরে ভালো করে না খেলে কাল বাপের বাড়ি চলে যাবেন। ভদ্দরলোকে শুধু শুধু মাংস খেতে পারে মামা। প্রসাদকে আজ এক গেলাস খাইয়ে দেব। ভদ্দরলোকের ছেলে—তিরিশ বছর বয়েস হল, একদিন একটু চেখে দেখলে না বিলিতির স্বাদ। আজ চাখিয়ে দেব।

প্রসাদ না— বাবু না।

বিশ্ব আরে মোলো –এটা মানুষ না বাঁদর ?—যাক, আমি চললাম যেমনটি বলেছি- সেইমতো যেন সব কাজ হয়। [বিশ্বম্ভর চলে গেল।]

গজেন দেখলে প্রসাদ ? দেখলে ? আমি ওর মামা, গুরুজন আমার সঙ্গে ব্যাভারটা দেখলে ? আমি মামা—আমি মদ এনে দেব—তাই উনি গিলবেন—।

প্রসাদ বড়ো তেজি মানুষ।

গজেন তেজি না তোমার মাথা। একটা পাষণ্ড—খাঁটি পাষণ্ড। তবু যদি মাইনে বাড়িয়ে দিত দশটা টাকা। তিনমাস ধরে বলে বলে মুখ ব্যথা হয়ে গেল, গেরাহ্যই করে না। বামুনের ছেলে চামড়ার ব্যাবসা করলে এমনই হয়—হাঁড়ি-মুচি ডোমের অধম হয়ে যায়।

প্রসাদ : [*সভয়ে*] আঃ একটু আস্তে আস্তে বলুন—শুনতে পাবেন যে ?

গজেন : [*চমকে উঠে তাড়াতাড়ি গলা নামিয়ে*] পায় পাবে। ওকে ডরাই আমি ? কী করবে আমার ? তাড়িয়ে দেবে ? দিক—তাড়িয়েই দিক। মামা হয়ে ভাগনেব দাসত্ব—ছোঃ !

প্রসাদ : আমার বাকি মাইনের কী হবে মামাবাবু ?

গজেন : ছাই হবে—কচুপোড়া হবে ! আজ না মাইনের কথা বলবেই ঠিক করেছিলে ? কই, এতক্ষণ ধরে এত কথা হল বলতে পারলে না বাকি মাইনেব কথাটা ?

প্রসাদ : সাহস হল না। মেজাজটা যেন কেমন কেমন--

গজেন : হুঁ—তবে আর তুমি বলেছ। এর চেয়ে ভালো মেজাজ ও গুন্ডাটাব কস্মিনকালেও দেখতে পাবে ভরসা কোরো না। মরুকগে বাবা—আমার কী ?—যাই আডত হয়ে বোতল দুটো নিয়ে আসি—যত সব ইয়ে—

[*শেষেব কথাগুলি বলতে বলতে যাবে*]

প্রসাদ : বাবুকে কেউ গাল দিলে শুনতে ভালোই লাগে, আবার কেমন বিশ্রী একটা অস্বস্তিও বোধ করি। গা কাঁপতে থাকে।

ফুলি : [*নিকটে এসে*] কাঁপবে না ? গা তোমাব সারাক্ষণ কাঁপবে ! পুরুষ মানুষ তো তুমি !

প্রসাদ : ওঃ—ফুলি ! আচমকা তোমায় দেখে চমকে গেছি—

ফুলি : চমকাবে না ? সারাক্ষণ চমকাবে ! পুরুষ মানুষ তো তুমি !

প্রসাদ : আজ যে বড়ো ঝাঁঝ দেখছি কথার !

ফুলি : হবে না ঝাঁঝ ? সব শুনেছি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে, সব দেখিছি। আজকেও বড়দা তোমায় বাঁদব নাচ নাচালে ? হেসে-কেঁদে ঘেমে-কেশে আজও ভূত বনে গেলে ? ছিঃ ছিঃ ! তোমার যত বাহাদুরি আমার কাছে। বকুলতলায় দাঁড়িয়ে কত লম্বা চওড়া কথা শোনানো হল আমায—স্পষ্ট কবে কথা কইব, বাকি মাইনে চেয়ে নেব, কত কী !—আব বড়দার সামনে গিয়ে কুকুরের মতো পা চাটতে লাগলে ! মা গো মা,—কী লজ্জা—কী ঘেন্না—

প্রসাদ : ফুলি—শোনো—

ফুলি : না, শুনব না। কথা কইব না তোমার সঙ্গে।

প্রসাদ : আহা—শোনোই না—

ফুলি : না শুনব না। আজ থেকে কোনো সম্পর্ক নেই তোমাব সঙ্গে।

প্রসাদ : [*হতাশাব সুরে*] সম্পর্ক আর হলো কই যে সম্পর্ক ছেদ কবছ ? আমাকে দিয়ে কিছু হবে না ফুলি, আমি একেবাবে অপদার্থ। আশা ভরসা আমি সব ছেড়ে দিয়েছি ! তুমি রাগ কোরো না ফুলি—

ফুলি : আমি রাগ করলেই বা তোমার কী ! আমি বুঝিনে ভেবেছ ? বড়দাব কাছে টাকাটা চেয়ে নিলে আমায় বিয়ে করতে হবে কি না, তাই তুমি ন্যাকামি করে আমায় ভুলোচ্ছো ! [*কাঁদোকাঁদো হয়ে*] আমার যেমন পোড়াকপাল—বাপ থেকেও নেই, কিন্তু দড়ি-কলসি তো আছে—পুকুরের জলও শুকোয়নি—

প্রসাদ : [*ব্যাকুল হয়ে*] কেঁদো না ফুলি, তা হলে আমিও কেঁদে ফেলব কিন্তু।

ফুলি : ওমা—সত্যিই কেঁদে ফেললে যে !

প্রসাদ : [*সামলে নিয়ে*] আমার ভেতরে কী রকম করছে তুমি জানো না ফুলি। বলতে কি চাইনি আমি ? সারাক্ষণ ছটফট করেছি বলার জন্যে। কিন্তু বলতে গিয়ে গলার কথা আটকে গেছে। শুধু যে ভয়ে তা নয়—বাবু চটে যাবেন, আগুন হয়ে গালমন্দ করবেন এ সব ভেবে

ভয়ে আমার বুক কাঁপছিল সত্যি ! কিন্তু শুধু ওইটুকুই নয়, আরও যেন কেমন একটা ভাব হচ্ছিল আমার। কেবলি মনে হচ্ছিল—বাবু কী ভাববেন, আমাকে আশ্রয় দিয়ে—

ফুলি : আশ্রয় কীসের ? দিন নেই রাত নেই গাধাব মতো খাটছ না তুমি বড়দার জন্যে ? গোড়ায় ঠিক হয়নি তোমার সঙ্গে যে বাড়িতে থাকবে, খাওয়া আব মাইনে পাবে ?

প্রসাদ : তা অবশ্য হয়েছিল।

ফুলি : তবে ?

প্রসাদ : তুমি বুঝবে না ফুলি ! সব ঠিক কথা ! কিন্তু বাবু কিছু মনে করবেন, মুখ ভার করে থাকবেন,—এই কথা ভাবলে আমার হাত পা অবশ হয়ে আসে। আর যদি তাড়িয়ে দেন—বলেন মাইনে নিয়ে ভাগো ?

ফুলি : ভাগবে। এখানে খেটে খাচ্ছ, অন্য কোথাও খেটে খাবে, আর—আর—আমাকে খাওয়াবে !

প্রসাদ : অজানা অচেনা জগতে কোথায় যাব ফুলি ? কে আমায় আশ্রয় দেবে ? এই শবীর আমাব একটুতেই ভেঙে পড়ে। বিদেশে কে আমার দিকে তাকাবে ! অজানা জায়গায় কত ভয়, কত কী বিপদ—

ফুলি বুঝেছি। এমনি কবেই আমাব দিন যাবে, নইলে তোমাব মতো লোকের সঙ্গে আমাব ভাব হয় ! মেয়েলোক হয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে এত যে পেড়াপিড়ি কবি তোমায, বুঝতে পার না কী জন্যে ? এ বাড়িতে থাকতে আমাব দম আটকে আসছে। প্রতি মুহূর্তে সাধ যায় ছুটে পালিয়ে যাই।

প্রসাদ : তুমি কেন বাবুকে বলো না ? তুমি বললে বাবু শুনবেন। তুমি বাবুর বোন !

ফুলি : ওঃ—সেদিকে জ্ঞানেব নাড়ি টনটনে ! দাদাকে বলে তোমার পাওনা মিটিয়ে দেব। নিজে ঘটকালি করে তোমায় বিয়ে কবব। তাবপব ? তারপর আমাকেই তো বলতে হবে—একটা চাকরি দাও বড়দা। সোয়ামিকে খাওয়াতে হবে ?—

প্রসাদ : সবাই অপমান করে বলে তুমিও আমায় অপমান করবে ফুলি ? আমি কি জানি না—আমি কত ভীরু, কত অপদার্থ ? জানি বলেই তো আরও ভীরু আরও অপদার্থ বনে যাই। যারা সোজা মানুষেব চোখের দিকে তাকায়, জোর গলায় কথা কয়, তাদের দেখি আর হিংসায আমাব বুক জ্বলে যায়। দিনরাত কী যেন একটা লড়াই চলে আমার মধ্যে, কী যেন একটা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়—। আমি বড়ো দুঃখী ফুলি, আমার বড়ো কষ্ট। মরতে ভয় করে, নইলে—কবে আত্মহত্যা কবে বসতাম !

ফুলি : ছিঃ—ও সব কথা বলতে নেই। নিজেকে তুমি ছোটো মনে কর, নইলে আসলে তুমি মোটেই অপদার্থ নও। এ বাড়িতে মনুষ্যত্ব যতটুকু একমাত্র তোমার মধ্যে আছে, আর সবাই তো অমানুষ। কারও ওপর অন্যায় করো না, কারও মনে কষ্ট দাও না—সব বকম অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য কর—

প্রসাদ : আমার একটুও মনের জোর নেই, হয়তো তাই—

ফুলি : সহ্যশক্তি মনের জোর নয় ? তুমি যে এত সহ্য কর মুখ বুজে, মনের জোর না থাকলে কেউ তা পারে ?

প্রসাদ : সহ্যশক্তি না ছাই। ক্ষমতা নেই তাই সহ্য করি।

ফুলি : নিজেকে তুমি কেন যে এত হীন ভাব—আমি তা ভেবে পাইনে। যাক গে—এ সব কথা ঢের বলেছি, বলে কোনো ফল হয় না। আচ্ছা, এক কাজ কর না কেন ? বড়দাকে না বলতে পার, বউদিকে বল না কেন ?

**প্রসাদ** : ও বাবা !

**ফুলি** : কেন ? বউদি তো তোমায় বেশ দরদ দেখায়। সর্বদা কাছে ডাকে, হেসে কথা কয---

**প্রসাদ** : না, না,—ওনাকে আমি কিছু বলতে পারব না।

**ফুলি** : আচ্ছা তবে আমিই বলবখন।

**প্রসাদ** : [*সভয়ে*] সর্বনাশ ! অমন কাজও কোবো না ফুলি। আমার বিষয় কোনো কথা কখনও তুমি ওনাব কাছে বলতে যেযো না ! বলো -- বলবে না ? কথা দাও !

**ফুলি** : কী ব্যাপার বলো তো? আর একবার তোমায় বলেছিলাম বউদিকে সব জানিয়ে দিই, সেবারও তুমি এমনই ভয় পেয়েছিলে ! আমি বউদিকে বলব তাতে তোমাব কী ? বলো, আজ তোমায বলতেই হবে।

**প্রসাদ** : [*ইতস্তত করে*] উনি আমাব ওপব বড়ো অত্যাচার করছেন, ফুলি।

**ফুলি** : অত্যাচার করছে ! তোমার ওপর কী অত্যাচাব করেছে ?

**প্রসাদ** : আমার অবস্থা তুমি বুঝবে না ফুলি ! বাবুর চেয়ে ওনাকে আমি আজকাল বেশি ভয করি। বাবুর গালাগালির চেয়ে ওনার মিষ্টিকথা আমার বেশি ভযানক লাগে। উনি কাছে এলে আমাব সমস্ত শবীব যেন অবশ হয়ে আসে। উঃ—কী ফাঁদেই যে পড়েছি ! আমি—আমি ওঁকে ঘেন্না করি—কিন্তু কাছে যখন যাই—

**ফুলি** : যাও কেন কাছে ?

**প্রসাদ** : যাই না তো ! কিন্তু ডাকলে—না গিযে কী করব ? বাবুকে যদি বলে দেন আমি ওঁব কথা শুনিনি। যদি তাড়িযে দেন আমাকে ! তা ছাড়া না গেলে উনিও তো বাগ করতে পারেন ! তাইতে যাই, ভয়ে ভয়ে। কাছে গেলেই আমি যেন নেশায আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি, জেগে থেকেও যেন ঘুমিযে গেছি মনে হয়। উনি যা বলেন তাই করি—। উনি বোধ হয় কোনো মন্ত্রতন্ত্র জানেন, ওই যে বশীকবণ না কী বলে--

**ফুলি** : ছি ছি ছি ! বউদি এমন মানুষ !

**প্রসাদ** : তুমি আমায় বাঁচাও ফুলি। আমায় রক্ষা করো। এ ভাবে আব কিছুদিন চললে আমাব মাথা খাবাপ হয়ে যাবে, আমি পাগল হয়ে যাব !—ফুলি !

**ফুলি** : আমাবও যে মাথা ঘুরচে, এ সব কী শোনালে তুমি আমায ? চলো—আমবা পালিযে যাই। পাওনা টাকার দরকার নেই, বিযেতে দরকার নেই, আজকেই চলো--আমরা দুজনে পালাই।

**প্রসাদ** : কোথায় পালাব ফুলি, তোমায় নিয়ে ? একা পালিয়ে যেতে ভরসা পাইনে, তোমায় নিযে কোথায় যাব, কী করব ? তা ছাড়া, সবাই কী ভাববে ভাবো দিকি ? মামাবাবুর মনে কষ্ট হবে, বাবু রাগ করবেন—

**ফুলি** : মাগো, আমার কী হবে---[*কান্না*]

[*দিগম্বরী ধীরে ধীরে ঘরে এল*]

**দিগম্বরী** : কাঁদছিস কেন লা ছুঁড়ি ! অ্যাঁ—?

**ফুলি** : [*সামলে নিয়ে*] কাঁদিনি তো।

**দিগ** : আ মরণ ! চোখে দেখলাম কাঁদচিস, কানে শুনলাম কাঁদচিস—তবু বলে কাঁদিনি তো ! এ ঘরে এসে প্রসাদের কাছে তোর কান্না কীসের লা ? জবাব দিসনে যে কথার ? আস্পদ্দা বেড়েছে, নয় ?

**ফুলি** : বেশ করেছে বেড়েছে। তোমার মতো তো বাড়েনি ?

**প্রসাদ** : [*সভয়ে*] ফুলি !

দিগ : কী বললি হারামজাদি ! আসুক তোর দাদা আজ বাড়ি, ওঁকে দিয়ে খড়মপেটা না করি তোকে, বাপের বেটি নই আমি !

ফুলি আর আমি যদি বড়দাকে বলে দিয়ে—

প্রসাদ [*বাধা দিয়ে সভয়ে*] ফুলি, ও ফুলি—কাকে কী বলছ ? —সর্বনাশ কোরো না, বাগের মাথায় যা তা বোলো না গুরুজনকে। মাপ চেয়ে নাও পায়ে ধবে মাপ চেয়ে নাও।

ফুলি কেন মাপ চাইব ? মরতে জানি না আমি—

[*কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল*]

দিগ এ-সব কী প্রসাদ ?

প্রসাদ আজ্ঞে ওর মাথার ঠিক নেই। ছেলেমানুষ কি না—

দিগ নাও, তোমাকে আর ও-ব সাফাই গাইতে হবে না। ছেলেমানুষ ! ছেলেমানুষি ঘোচাচ্ছি আমি, কালই দূর করে দেব বাড়ি থেকে। কিন্তু তোমার ছেলেমানুষ কচিখুকিটি তোমার কাছে কান্নাকাটি কচ্ছিল কেন শুনি ?

প্রসাদ আঁ ? কী ? কী ?

দিগ ন্যাকামি কোরো না, স্পষ্ট কবে বলো।

প্রসাদ আজ্ঞে, বলছিল কী—খোঁড়া বলে ওকে কেউ ভালোবাসে না।

দিগ তাই তোমার একটু ভালোবাসা চাইছিল—না ?

প্রসাদ না, না—ছিঃ। কী যে বলেন ! বলছিল কী—এখানে মন টিকছে না, কদমতলায় পিসির কাছে যেতে চায়, আমি যদি আপনাকে বলে কয়ে—

দিগ : বানিয়ে বলছ—নিশ্চয় বানিয়ে বলছ ! এত লোক থাকতে তোমায় কেন বলতে এল শুনি ?

প্রসাদ : আজ্ঞে, দেখেছে তো আপনি আমায় একটু অনুগ্রহ করেন, আবদার করলে রাখেন—

দিগ : [*খুশি হয়ে*] তোমাব ওই আজ্ঞে হুজুর রাখো তো, ভাল্‌লাগে না বাপু। সত্যি বলছ তো, পিসির কাছে যাবার কথা বলছিল ? না, ভাব-টাব হয়েছে তোমাদের দুজনের ?

প্রসাদ : ছি—ছি—!

দিগ . টের যদি পাই, কী কাণ্ড করি দেখো। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া চলবে না—এই তোমায় বলে দিচ্ছি। কী দেখছ প্রসাদ অমন করে ?

প্রসাদ · [*মরিয়া হয়ে*] আপনি আগুনের মতো সুন্দব।

দিগ : বাবাঃ—কী কথার ছিরি ! এত সুন্দব আমি, তবু তো না ডাকলে একবারটি চোখের দেখা দেখতে যাও না !

প্রসাদ : ভয় করে।

দিগ : ভয় ? ভয় আবার কী, ভয় ? টান থাকলে যেতে।

প্রসাদ : আপনার জন্যে আমি মরতে পারি।

দিগ : মরতে পার কিন্তু মান্যি করে কথা কওয়া ছাড়তে পার না। কেউ তো নেই এখানে যে শুনবে ? কেমন করে তাকিয়ে আছে দ্যাখো ! ঠিক যেন স্বপ্ন দেখছে। তুমি কী বলো তো প্রসাদ ? কী আছে তোমার মধ্যে ? [*দাঁতে দাঁত ঘষে*] এমন রাগ হয় আমার মাঝে মাঝে, ইচ্ছে করে—

বিশ্ব : [*দূর থেকে*]—প্রসাদ—!

প্রসাদ : [*সভয়ে*] আজ্ঞে—!

বিশ্ব : [*কাছে এসে*] এই রাস্কেল। তোমায় না বললাম—টাকা নিয়ে কারখানায় চলে যেতে ?

**দিগম্বরী** : বোকো না গো। ওর কোনো দোষ নেই। আমি কথা কইছিলাম।

**বিশ্ব** : ওঃ—তাই নাকি। কী কথা কইছিলে ?

**দিগ** : বলছিলাম, বিয়ে করে একটি টুকটুকে বউ নিয়ে আসুক।

**বিশ্ব** : বিয়েটাই বাকি আছে। [*হাসি*]

**দিগ** : হেসো না অমন করে, বেচারি লজ্জা পাচ্ছে।

**বিশ্ব** : আচ্ছা, বিয়েটা পরে কোরো প্রসাদ, এখন চটপট কারখানায় চলে যাও তো ! এই নাও টাকা, সাবধানে যেও—

**দিগ** : পেনোর মাঠ পেরিয়ে যাবে তো ? আমার জন্যে জাম পেড়ে এনো কিন্তু, প্রসাদ !

**প্রসাদ** : [*সভয়ে*] আজ্ঞে—আচ্ছা—!

বিস্তৃত পেনোর মাঠ। দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে। প্রসাদ একা। ভয়ে ভাবনায় তার থমথমে চেহারা।

**প্রসাদ** : এই মাঠ পেরোতে হবে আমায়। এখনও বেশির ভাগ পথ বাকি। ওদিকে আদ্দেক আকাশ দেখতে দেখতে মেঘে ছেয়ে গেল। ওঃ—কী ভীষণ চেহারা মেঘের। গুলিয়ে গুলিয়ে পাক খেয়ে খেয়ে আকাশ বেয়ে উঠছে···এখুনি ঝড় উঠবে—! কী করি এখন ? কোথায় যাই ? এই মাঠের মধ্যে ঝড় উঠলে আমি তো বাঁচব না ! কী কবি এখন ? ফিরে যাব ? ওরে বাবা, বাবু তা হলে আর রক্ষে রাখবে না। কিন্তু কী করি এখন ? মাঠের মাঝখানে এসে পড়েছি, এদিকে গ্রাম যদ্দুর—ওদিকে কারখানাও তদ্দুর—!

[*বাতাসের শব্দ*]

আর বাঁচা গেল না ! ওই ওই—ঝড় এল—

[*বাতাসের বেগ বাড়তে থাকবে*]

ওরে বাবা—এ যে অন্ধ হয়ে গেলাম ধুলোয় ! শুকনো ডালপালা এসে চাবুকের মতো গায়ে পড়ছে। পালাতে হবে। কোনদিকে পালাই ? অ্যাঁ কোনদিকে পালাই ?

[*বাতাস বইতে থাকবে তেমনিভাবে*]

উঃ—পড়ে গেলাম যে ! কিন্তু পড়ে গেলে তো চলবে না। উঠে পালাতে হবে। উঃ—আবার ফেলে দিলে—আমায় পালাতে দেবে না—! ঝড় এইখানে ফেলে আমাকে মেরে ফেলবে। আমি মরব না—মরতে পারব না।

[*বাতাসের সাথে বৃষ্টি ও বিদ্যুতের শব্দ*]

উঃ—গেলাম—গেলাম—কান ফেটে গেল !

[*গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ*]

[*আর্তনাদ করে*] আঃ—! গাছ ভেঙে পড়েছে ! অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি। শুধু ডালপালার ঘা লেগেছে। মনে হল কে যেন হাজার চাবুক দিয়ে আমায় মারলে ! এখানে গাছের কাছে থাকলে তো চলবে না, ফাঁকায় যেতে হবে। গাছের কাছ থেকে সরে যেতে হবে।—

[*বাতাসের সাথে বৃষ্টি ও বিদ্যুতের শব্দ*]

এখানে গাছ নেই এইখানেই একটু বসি। পালাতে পেরেছি—কেউ আর গাছ চাপা দিয়ে আমায় মারতে পারবে না। এখান থেকে আর নড়ছি না আমি। এই গ্যাঁট হয়ে বসলাম, মরি তো এইখানে বসে মরব।

[*ঝড়ের দিকে মুখ করে*]

আয় আয় [*উন্মাদের মতো হাসি*]

—আরও জোরে আয়—ছিষ্টি ভলিয়ে দে ! পেসাদচন্দর আর ডরায় না।—মারবি তো মার—দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি আর করছিনে বাবা—আমায় নিয়ে ছিনিমিনি আর খেলতে দিচ্ছি না ! তোর ঝড়ের নিকুচি করেছে। আয় দেখি তোর কত জোর ! আরও জোরে আয় !

[*খুব জোরে বাতাসের শব্দ হয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়*]

**প্রসাদ** : ঝড় একটু কম মনে হচ্ছে। কোথাও আশ্রয় নিতে পারলে হত।

[*ট্রেনের হুইসেল্*]

এ কী ! ছুটোছুটি করতে রেল লাইনের এত কাছে এসে পড়েছি ! ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে না একটা ? ওই তো পেছনের আলো দেখা যাচ্ছে। লাল একটা বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে। দিগম্বরীর কপালের সিঁদুরের মতো। দিগম্বরী ? ওই যত নষ্টের গোড়া। ওর জন্যে জাম পাড়তে গিয়েই তো দেরি হয়ে গেল। নইলে ঝড় ওঠবার আগেই হয়তো মাঠ পেরিয়ে যেতাম !

[*ট্রেনের হুইসেল্*]

গাছটাছ বোধ হয় ভেঙে পড়েছে লাইনে। ট্রেনটা দাঁড়িয়েই আছে। এক কাজ করলে হয় না ? এখানে বসে না থেকে ট্রেনের একটা কামরায় ঢুকে তো বসতে পারি ট্রেন ছাড়া পর্যন্ত। তাই করা যাক। কেন এখানে বসে কষ্ট পাই মিছিমিছি !

[*উঠে এগিয়ে যায়*]

ট্রেন দাঁড়িয়ে। যাত্রীদের কোলাহল

**যাত্রী** বসুন না। বসে পড়ুন। অ্যাকসিডেন্ট নাকি ?

**প্রসাদ** না ! অ্যাকসিডেন্ট নয়।

**যাত্রী** রক্তে যে মাখামাখি হয়ে গেছেন !

**প্রসাদ** রক্ত ?

**যাত্রী** : জল, কাদা, রক্ত সব আছে। ভয়ংকর দেখাচ্ছে আপনাকে। রুমালটা নিন। মুছে ফেলুন।

**প্রসাদ** : থাক ! একেবারে বাড়ি গিয়ে চান করে ফেলব। ঝড়ের মধ্যে ছুটোছুটি করতে গিয়ে আছাড় খেয়েছি। একটু কেটে ছড়ে গেছে আর কী !

**যাত্রী** : একটু ! আপনি তো খুব বেপরোয়া লোক দেখছি। ঝড়ের সময় বাইরে ছুটোছুটি করতে ভালোবাসেন বুঝি ? আমারও মশায় এমনই স্বভাব ছিল ছোটোবেলায়। ঝড় উঠলে ফুর্তির চোটে কী করব ভেবে পেতাম না।

**প্রসাদ** : বলেন কী ?

**যাত্রী** : আপনাকে দেখে সাধ হচ্ছে আমিও বাইরে গিয়ে একটু মাতামাতি করে আসি।

**প্রসাদ** : আপনি কোথায় যাবেন ?

**যাত্রী** : ভিজিগাপট্টম।

**প্রসাদ** : সে তো অনেক দূর !

**যাত্রী** : [*হেসে*] দূর তো হয়েছে কী ! সেখানেই থাকি, ব্যাবসা আছে !

**প্রসাদ** : দেশ ছেড়ে এত দূরে গিয়ে—

**যাত্রী** : আর বলেন কেন। বারো বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম বোম্বাই। তারপর থেকে পনেরো-বিশবছর ধরে এখানে ওখানে পাক খেতে খেতে ভিজিগাপট্টমে ব্যাবসা ফেঁদে বসলাম। সেখানেই আটকে গেছি সেই থেকে।

**প্রসাদ** : বারো বছর বয়সে ? ভয় হয়নি ?

**যাত্রী** : ভয় ? ভয় কীসের ?

**প্রসাদ** : এই অজানা অচেনা জায়গায় যাবেন, কোথায় থাকবেন, কী করবেন—

**যাত্রী** : জায়গা কি অজানা অচেনা থাকে ? যতক্ষণ না যাবেন, ততক্ষণ। গিয়ে পড়লেই জানাশোনা হয়ে যায়। মানুষের বাচ্চার আবার থাকার ভাবনা। সব জুটে যায়। পাহাড়ে, জঙ্গলে, মরুভূমিতে, মানুষ নিজেব ব্যবস্থা কবে টিকে আছে।

*[ট্রেনেব হুইসেল]*

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। চট করে নেমে পড়ুন।

**প্রসাদ** : আপনার নামটি জানতে পারি ?

**যাত্রী** : প্রসাদ। আপনার ?

**প্রসাদ** : আমারও ওই নাম, প্রসাদ।—

*[ট্রেন চলাব শব্দ এবং আস্তে আস্তে তা মিলিয়ে যাবে]*

**বিশ্বম্ভর** : আঃ ! কী গন্ধই বেরিয়েছে তোমার মা'সের ! জিভে জল আসছে !

**দিগম্বরী** : খাবে নাকি এখন ?

**বিশ্বম্ভর** : একটু পরে ! খিদেটা চড়িয়ে নিই ! বৃষ্টি ধবে এসেছে, মামা এইবাব এসে পড়বে। কিবে ফুলি, তোর মুখ এত শুকনো কেন ?

**ফুলি** : দাদা, প্রসাদবাবু এল না কেন এখনও ?

**বিশ্ব** : প্রসাদবাবু ! প্রসাদ আবার বাবু হল কবে থেকে বে ? ওটাকে অত সম্মান কবে কথা বলিস নে ফুলি, শুনলে হাসি পায়।

**ফুলি** : ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়া শিখেছে—

**বিশ্ব** : ওটা একটা বাঁদর, আস্ত বাঁদর ! ওটাকে সত্যি মানুষ বলে মনে হয না !

**ফুলি** : মানুষ হতে দিলে মানুষ হত। তোমরা সবাই মিলে ওকে পাযের নীচে পিষে বেখেছ।

**দিগ** : তা, ওর জন্যে তোর এত দরদ কেন শুনি ? ঝড় ওঠার সময় থেকে ছটফট কবছিস, কোথায় গেল, কী হল।

**ফুলি** : দরদ আবার কী! লোকটা কেমন ভীরু তা তো জান না। ঝড়ের সময় বাড়িতে থাকলে ঘরের কোণে লুকিয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে থাকে। সেই লোক এই ঝড়ের মধ্যে বাইরে আটকে গেছে, হার্টফেল করে মরে গেছে কিনা কে জানে !

**বিশ্ব** : তা ও মরতে পারে, আশ্চর্য নয় !

**ফুলি** : কেন তবে পাঠালে তুমি ওকে ? ঝড় আসছে জেনেও পাঠালে কেন ?

**বিশ্ব** : *[গর্জন কবে]* কী বললি ! আমার চাকরকে আমি কোথায় পাঠাব, সে কৈফিয়ত তোর কাছে দিতে হবে ?

**দিগ** : তোর বাপও তো ঝড়ের মধ্যে বাইরে গেছে। বাপের জন্যে তো এতটুকুও ভাবনা দেখছি না তোর।

**ফুলি** : বাবার কিছু হবে না। বাবা ওর মতো ভীরু নয়।

**দিগ** : প্রসাদ তোর কে ?

**ফুলি** : কে আবার। কেউ না।

**দিগ** : স্বয়ম্বরা হবার সাধ আছে নাকি গো কন্যে ? তাই তো বলি, একা পেলেই মেয়ে গিয়ে পেসাদের কাছে ঘুরঘুর করেন।

[ *গজেনের প্রবেশ* ]

**গজেন** : [ *একটু জড়ানো গলায়* ] কী হয়েছে ?

**বিশ্ব** : বাঃ ! মামা যে বেশ সরগরম দেখছি।

**দিগ** : শুনছ ? তোমার মামাকে বলে দাও, সাতদিনের মধ্যে যদি মেয়ের বিয়ে না দেন তো আমাব বাড়িতে জায়গা হবে না। মেয়ে ধেড়ে করে রাখতে চান অন্য জায়গায় রাখুন গে। এখানে চলবে না। বলে দাও মামাকে।—

**বিশ্ব** : আর বলে দিতে হবে না। মামার কান আছে।

**গজেন** : বউমাকে শুধোও দিকি ফুলি কী করেছে।

**বিশ্ব** : শুনলে তো ? জবাব দাও !

**দিগ** : মামাকে বলো, ওনার মেয়ে নিজেই বর খোঁজবার চেষ্টায় লেগেছেন। কদ্দুর কী করেছেন উনিই জানেন।

**ফুলি** : [ *তীব্রকণ্ঠে* ] বউদি !

[ *গজেন মেয়েব গালে চড বসিয়ে দিল ফুলি কাঁদল না। তীব্র দৃষ্টিতে নীববে চেয়ে বইল* ]

**বিশ্ব** : কী করছ মামা ? অত বড়ো মেয়ের গায়ে হাত তোলে ?

**গজেন** : সামনে যে ভালো দিন আছে, বংশীর সঙ্গে সেই দিনে বিয়ে দিয়ে দেব।

**বিশ্ব** : তামার আড়তের বংশী ? না, না, ও গাঁজাখোর বুড়োর সঙ্গে নয়। বরং পেসাদের সঙ্গেই দাও না মামা।

**দিগ** : তুমি চুপ কবো। পেসাদের সঙ্গে ওর বিয়ে হয না।

**বিশ্ব** : কেন ? ওরা তো স্বঘর।

**দিগ** : হোক স্বঘব। পেসাদ ওকে বিয়ে করবে না। ওকে পেসাদ দেখতে পারে না। ওর রকম সকম দেখে পেসাদ সেদিন আমার পায়ে ধরে কেঁদেছিল। আমি বললাম, কাঁদছ কেন পেসাদ ? পেসাদ বললে, আপনি আমায় রক্ষে করুন ও ডাইনির হাত থেকে।

[ *গজেন আবাব ফুলিকে মাবতে হাত তোলে* ]

**বিশ্ব** : মামা ! ফের হাত তুলছ ? একবার বারণ করলাম, কানে গেল না বুঝি ? বড়ো তো স্পর্ধা বেড়েছে তোমার ! কাঁদিস নে ফুলি।

**দিগ** : যা তুই। যা এখান থেকে।

**বিশ্ব** : পেসাদ তোমাব পায়ে ধরে ও কথা বলল ? ডাইনির হাত থেকে রক্ষা করুন ! ছোঁড়াটা তো শুধু ভীরু অপদার্থ নয়—বজ্জাতের ধাড়ি ! হারামজাদা আজ আসুক।

**দিগ** : তুমি পেসাদকে কিছু বলতে পাবে না।

**বিশ্ব** : কেন ?

**দিগ** : ওর কোনো দোষ নেই। ফুলিকে ওর পছন্দ হয না, ফুলি ওকে জ্বালাতন কবে। বেচারি ভয়ে ভাবনায় কাঠ হয়ে থেকেছে। কখন কী করে বসবে হতচ্ছাড়ি মেয়ে, দোষ তো হবে পেসাদের। তুমি নিজেই তখন ওর ঘাড় মটকাবে।

**বিশ্ব** : মাঝে মাঝে সত্যি ইচ্ছে করে ওর ঘাড়টা মটকে দিতে। ওই যে আসছেন পেসাদবাবু। অ্যাঁ ! কী চেহারা হয়েছে ছোঁড়ার !

**দিগ** : ইস্ !

[ *জলকাদা বক্তমাখা ঝড়ে বিধ্বস্ত চেহাবা নিয়ে প্রসাদ এল। তাব পদক্ষেপ দৃঢ়। মেরুদণ্ড সিধা।* ]

**প্রসাদ** : কারখানায় যেতে পারিনি।

**বিশ্ব** : কেন ?

প্রসাদ : পেনোর মাঠে ঝড়ে আটকে গেলাম।

বিশ্ব : আটকে গেলে। মাঠটুকু পেরিয়ে কারখানায় যেতে পারলে না ? ভ্যাবা গঙ্গারাম কোথাকার !

দিগ : পেসাদ ! এ কী ভীষণ চেহারা হয়েছে তোমার। কাদা রক্ত ধুয়ে এসো, চান করে এসো। তোমায় দেখে ভয় হচ্ছে।

বিশ্ব : টাকা দিয়ে যাও।

প্রসাদ : আজ্ঞে টাকাটা—

বিশ্ব : টাকা হারিয়ে এসেছিস !

প্রসাদ : ঝড়ের সময় পেনোর মাঠে কোথায় পড়ে গেছে।

বিশ্ব : হতভাগা ! নচ্ছাড় !

*[বিশ্বম্ভর লাফিয়ে উঠে তাকে মারতে যায়]*

প্রসাদ : *[ভয়শূন্য বিস্মিত কণ্ঠে]* আমায় মারবেন ! আমি ভদ্রলোকের ছেলে, কটা টাকার জন্য আমায় মারবেন !

বিশ্ব : না, মারব না, পুজো করব। তোকে বেচলেও অতগুলো টাকা হবে না, তা জানিস ?

প্রসাদ : *[চাপা দৃঢ়গলায়]* গায়ে হাত দেবেন না। খবর্দার গায়ে হাত দেবেন না বলছি !

বিশ্ব : *[সুর বদলে]* তুমি কি গাছ চাপা পড়েছিলে ?

প্রসাদ : না, চাপা পড়ছিলাম, অল্পের জন্য বেঁচে গেছি। টাকাটা যদি না পাওয়া যায়, আমার মাইনে থেকে কেটে নেবেন।

বিশ্ব : তোমার মাইনে !

গজেন : ওরে ছোঁড়া ! তোমার পেটে চালাকি ! টাকা তুমি হারাওনি—মাইনে বলে আদায় করে নিয়েছ। জানো বাবা, কদিন থেকে মাইনে মাইনে করে আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছে। তোমায় বলতে সাহস হয় না, আমার কাছে ঘ্যানঘ্যান করে। চাইলে পাবে না জানে, তাই চালাকি করে বাগিয়ে নিল। টাকা হারিয়েছে মাইনে থেকে কেটে নিয়ো।

প্রসাদ : আমার তিন বছরের ওপরে মাইনে বাকি আছে !

বিশ্ব : তোমার আবার মাইনে ! খেতে পরতে দিয়েছি !

প্রসাদ : খাওয়া পরা আর তিরিশ টাকা করে মাইনে দেবেন বলেছিলেন। যে টাকা হারিয়েছে তার চেয়ে বেশিই পাওনা হবে আমার।

বিশ্ব : তোমার কী হয়েছে হে বাপু ? কামড়ে দেবে নাকি ?

প্রসাদ : কামড়ে দেব কেন ?

বিশ্ব : রকম দেখে তাইতো মনে হচ্চে ! চান করবে যাও। মাথা ঠান্ডা হোক ! তারপর কথা কইব !

প্রসাদ : আমার মাথা গরম হয়নি।

বিশ্ব : বেশ বেশ, জামাকাপড় ছাড়বে তো ? ভালো করে সাবান মেখে চান করো গে ! ভালো করে ধুয়ে যেখানে যেখানে কেটে গেছে টিঞ্চার আইডিন লাগিয়ে দিয়ো ! একটু ব্র্যান্ডি খাবে ?

প্রসাদ : না, আমি কিন্তু চোর নই ! টাকাটা সত্যি পেনোর মাঠে পড়ে গেছে।

বিশ্ব : না বলছে কে !

প্রসাদ : খুঁজে পেলে টাকাটা আমি মাইনে বাবদ নেব।

বিশ্ব : আচ্ছা আচ্ছা সে হবেখন। চল মামা, আমরা একটু টানিগে।

*[বিশ্বম্ভর ও গজেন তার দিকে তাকাতে তাকাতে একরকম পালিয়ে যায়]*

দিগ : তোমায় দেখে ভয় করছে পেসাদ। কী চেহারা হয়েছে তোমার। উনি পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেছেন।

প্রসাদ : ভয় পেলেই মানুষ ভয় পায় !

দিগ : অমন করে তাকিয়ো না ! আমার গা কাঁপছে। নেয়ে এসো, গরম গরম মাংস দিয়ে ভাত দেব।

প্রসাদ : তোমার রান্না আমি খাব না।

দিগ : খাবে না ? কেন ?

প্রসাদ : ঘেন্না করবে ! এতকাল ঘেন্না করেছে—তবু তোমার রান্না চোখ কান বুজে খেয়েছি। আর খাব না !

দিগ : [*বেগে*] কী বললে ? [*ভয়ের সুরে*] না না অমন করে তাকিয়ো না ! তুমি কি পাগল হয়ে গেছ পেসাদ ? তোমার চোখ দেখে ভয় করছে। কেন তাকাচ্ছ অমন করে ? কেন ভয় দেখাচ্ছ ? আচ্ছা আচ্ছা আমি যাচ্ছি।

[*দিগম্বরী পালিয়ে যায়*]

ফুলি : ওগো মাগো, তোমার কী হয়েছে। কোথায় তুমি ছিলে ? এমন লাগল কীসে ?

প্রসাদ : আমার কিছু হয়নি ফুলি ! শরীর থেকে কিছু রক্ত বেরিয়ে গেছে। কিন্তু উপকার যা হয়েছে বলার নয় ! ফুলি আজ আমি মুক্তি পেয়েছি—নিজের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি। আমি কাউকে ভয় করি না। আমি স্বাধীন।

ফুলি : কী বলছ তুমি ?

প্রসাদ : ঠিক কথাই বলছি। পেনোব মাঠে কালবোশেখির ঝড়ে লড়াই করে আজ মরে বেঁচেছি। আমি ভয় করতে ভুলে গেছি ফুলি ! বাড়ি এসে বিশুবাবুকে দেখে প্রথমেই আমার মনে হল, এই একটা সামান্য দুর্বল মানুষকে আমি এত ভয় করতাম ! তারপর টাকা হারিয়েছি বলে বিশুবাবু যখন আমায় মারতে এলেন, প্রথমটা আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কিন্তু চেয়ে দেখি বিশুবাবু ভয় পেয়েছেন। কাছে এসে আমার চোখের দিকে চেয়ে ভয়ে বিশুবাবুর বুক কাঁপছে। জানো ফুলি, আমায় দেখে বিশুবাবু ভয় পেয়েছেন !

ফুলি : আমি দেখেছি। বউদিও তো ভয় পেয়ে চলে গেলেন।

প্রসাদ : হ্যাঁ।

ফুলি : আমি কিন্তু ভয় পাচ্ছি না।

প্রসাদ : ভয় পাচ্ছ না তো ? তবে চল পেনোর মাঠে যাই। একটা লণ্ঠন নিয়ে চলো। আমি জামা কাপড় বদলে আর একটা লণ্ঠন নিয়ে বাঁশতলায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। তুমি ওইখানে যেয়ো। ওখান থেকে দুজনে মিলে পেনোর মাঠে গিয়ে টাকাটা খুঁজে তিনটের গাড়িতে ভিজিগাপট্টম চলে যাব !

ফুলি : ভিজিগাপট্টম ? সে কোথায় ?

প্রসাদ : সেখানে আমার মিতা থাকে।

# আপদ

চাল নেই ? বাঃ, বেশ !

সকালবেলা কী শুভ সংবাদ ! স্বাধীনতা পাওযাব বাসি পচা সংবাদটাব মতো। জর্জব প্রাণে আর এক দফা জ্বব এনে দেয়। রাত্রে নলিনী খববটা চেপে গিযেছিল , আপিস ফেরত কেবানি বেচারাকে তখন ও খববটা জানিযে আর লাভ কী। কালোবাজাবে ছাড়া চাল নেই। হোক সে সবকাবি কেরানি, স্বাধীন দেশেব স্বাধীন সরকারের বেতনভুক্ত। রাতারাতি চাল-বাড়ন্ত সমস্যাব সমাধান কবাব সাধ্য তাব নেই। নলিনীব মতে, সরকার স্বাধীন বলেই কেরানিদেব দাসত্বেব ডিগ্রি চড়েছে। তাব যুক্তি আর ব্যাখ্যা একটু তির্যক ও রসালো হয, কাবণ সে কথাগুলি বসিকতা কবেই বলে। এত চড়া তার ক্ষোভ যে বেশি তেতে লোহা জ্যোতির্ময় হওয়ার মতো তার প্রাণের জ্বালা ব্যঙ্গ হয়ে বিচ্ছুবিত হয !

আমি কী করব ? নলিনী আলগোছে বাঁকা হাসি হেসে বলে, তোমবা স্বাধীন হযেছ, আমবা তো হইনি। আমরা ঘবের কোণে হাঁড়িই ঠেলছি। হাঁড়ি চড়াবাব ব্যবস্থা তোমবা বাদ দিযেছ, আমবা করব কী ?

কেউ যেন তাকে কিছু করতে বলেছে ! এই রকম ঢং হযেছে নলিনীব কথার, শুধু আজকাল নয়, অনেকদিন থেকে। আগে অন্যকথাব ঠেকা দিত, আজকাল কথায কথায এই স্বাধীনতাব কথা তুলে খোঁচায়। কথা আরম্ভ কবে আমি দিযে, পবক্ষণে তা দাঁড়ায আমবা ও তোমবাব ব্যাপাবে। সে যেন কণাদ বাযের বউ নয়, সে ভিন্ন একটা জাতেব একজন এবং কণাদ অন্য একটা জাতেব প্রতিনিধি। ঘরে চাল নেই এ কি নতুন কিছু ? প্রাযই এক রকম চাল থাকে না, প্রায সকলেব ঘরেই। নলিনী এমনভাবে খববটা দেয যেন তাবই পরামর্শে গভর্নমেন্ট ঘরে ঘবে চালেব অনটন ঘটিযেছে, লোভী ব্যবসায়ীদের চাল আটা কাপড়চোপড় সিকেয় তোলাব ষড়যন্ত্রে সেও যেন একজন অংশীদাব। সেই যেন এই বিশ্বাসঘাতকেব জগতে সবাব সেরা বিশ্বাসঘাতক।

ঘবের কোণে হাঁড়ি ঠেলে বলে ? অন্যদের হাতের কাছে পায না, একমাত্র পুবুষ তাকেই পায় বলে ? কিন্তু তাকে পুরুষ মনে কবে কি নলিনী ! কথা শুনে সন্দেহ জাগে আজকাল !

আজকেই চাল ফুরোল ? বিষ্যুদ্‌বাব পর্যন্ত যেত না ?

পেট বাড়েনি দুটো ?

বাড়িতে লোক বাড়েনি, পেট বেড়েছে দুটো, পেট ! কথার কী ছিরি নলিনীব। পাকিস্তান থেকে দুজন আত্মীয় এসে ঘাড়ে চেপেছে বটে এবং তাদের পেট ভরাতে হওয়ায় রেশনের আইনি চাল-আটা মঙ্গলবারেই শেষ হয়েছে। রেশন কার্ড সংগ্রহের হাঙ্গামা চুকলে আশা করা যায় ভবিষ্যৎ সপ্তাহে আবার বিষ্যুদ্‌বাব পর্যন্ত সবকারি বরাদ্দ খাদ্য টানা চলবে। শুক্রবার সকালে নলিনী মনে করিযে দেবে ঘরে একদানা চাল নেই, একগুঁড়ো আটা নেই—তার আগে নয়। তখন চোরাবাজারে যাবে চালেব সন্ধানে। বারবার এই কথা ভেবে বুকে বল পাওয়া যাবে যে মোটে তিনটি দিন, শুধু আজ কাল আর পরশু, শুক্র, শনি আর রবিবারটা চোরা চালে কোনোরকমে চালান—হিসেব করে, আরও কম খেয়ে, কোনোরকমে। সোমবার আবার বেশন মিলবে !

নলিনী মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছে ইট-সুরকি সিমেন্টের নূতন গাঁথনিটার দিকে। বাড়ির পাশে কী তাড়াতাড়ি যে গড়ে উঠছে সিনেমা হাউসটা। ওষুধের নেশা'র মতো সস্তা আনন্দের জোলো দুটি ঘণ্টার জন্য বিব্রত অতিষ্ঠ মানুষ পয়সা দিচ্ছে, সে লাভে ভাগ বসাতে একদিন দেরিও যেন সইবে না।

তাড়াতাড়ি গড়ে তোলো, রোশনাই জ্বালো, দুয়ার খুলে দাও —কিছু রেডিয়ো-মার্কা মাছি-ওড়া সুরের ভনভনানি, কিছু দেশপ্রেম আর বিপ্লবী নায়ক-নায়িকার বাসরঘরের বিপ্লবে সমাপ্তি, এরই জন্য ভিখারির মতো মেয়ে-পুরুষ এসে ভিড় করুক টিকিট ঘরের দরজায় !

নিজের চিন্তায় চমক লাগে কণাদের—এ তার স্বকীয় নয়, নলিনীই এমনি করে বলে। চোখে কি জল নলিনীর ? না চকচক করছে মনের জ্বালায় ?

কী ভাবছ জানি, নলিনী ভারী গলায় বলে, নিজের পেটে পুরিনি আমি সব। কাল রাত্রে উপোস গেছে আমার। আচমকা মুখ ফিরিয়ে সে মুচকে হাসে, মেয়েরা উপোস দিলে আগে মাছের একটা আঁশ দাঁতে কাটত। মাসের ন-দশ তারিখ হল মাছের গন্ধও আসে না বাড়িতে। কী করি বল ? তোমরা স্বাধীন হয়েছ—

থলি দাও। দুটো দিয়ো, বাজারটাও সেরে আসব।

থলি নিয়ে কণাদ পালিয়ে যায়।

কিছুদিন আগেও কণাদ বোঝাত, তর্ক ও রাগাবাগি করত। শেষে বলত, তুমি কী বুঝবে, তুমি মেয়েমানুষ, তোমার ত্যাগ নেই, ধৈর্য নেই, তুমি স্বার্থপর ! সম্প্রতি সে আর উৎসাহ পায় না। যত সহজ ভেবেছিল অত সহজ নয় ব্যাপার, না স্বাধীনতার প্রশ্ন না তার প্রতি নলিনীর অদ্ভুত জ্বালার মানে। ছোটো ভাই চেঁচিয়ে পড়ছে, এমনই চেঁচিয়ে সেও একদিন পড়ায় মন বসাত, আলস্য কাটাত। পূর্ববঙ্গের পলাতকা আত্মীয়া দুটি, মা ও মেয়ে, স্যাঁতসেঁতে উঠানটুকুর কোণে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরামর্শ করছে—সবাইকে খেতে দিয়ে নলিনী যে কাল না খেয়ে ছিল সেই বিষয়ে কী ? অথবা নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ? কাকিমা আর খুকিকে এখানে রেখে রমেশকাকা ছেলেকে নিয়ে হোটেলে উঠে যে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছে সে জন্য কণাদের কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। তবু কাকিমা আব খুকিকে তাব মাবতে ইচ্ছা হয়।

এত সকালেই সিনেমা হাউসটার কাজ শুরু হয়ে গেছে, সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ চলবে। মিস্ত্রি আর কুলিরা কীরকম মজুরি পায় ? ভালোই পায় নিশ্চয়, দিন ভালোই চলে নিশ্চয়, নইলে কথায় কথায় স্ট্রাইক করাব এত তেজ কোথায় পেত ! হলদে কার্ডে ওদেব রেশন পর্যন্ত বেশি ববাদ্দ করা হয়েছে দেশের এমন সংকটের সময়ে। ভবিষ্যৎ গড়বার বা ভাঙবার এই সন্ধিক্ষণ, ওবা যদি শুধু আদায় করার ফিকির ছেড়ে এই দুর্দিনে—

এ যেন মুখস্থ করা চিন্তা, তোতাপাখির মতো শুধু আবৃত্তি করা নিজেব মনে, পরের কাছে। নিজের মনও আর সায় দিতে চায় না। ইট গেঁথে গেঁথে নূতন দালান উঠছে, তার বিশ্বাসের ইমারত পড়ছে ভেঙে ভেঙে। ভালোই যদি চলে, সুখস্বাচ্ছন্দ্যে যদি তেজ বাড়ে, উদয়াস্ত খেটে কেন মরবে মানুষ ? নিজেই কি সে খাটত ?

নলিনী বলে, বোকো না বেশি। এতটুকু আশা ভরসা থাকলে মানুষ যেন কষ্ট সইতে নারাজ হয়। ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আধপেটা খেয়ে প্রাণপাত করে না মানুষ একটু সংস্থানের জন্য ? মানুষ কি ভূত যে সুখে থাকতে নিজেকে কিলোবে ? ত্যাগ ত্যাগ করে তোমরা সবাইকে সন্ন্যাসী বানাতে চাইছ !

তোমরা ! তাকে তোমরা ছাড়া সম্বোধন করতে নলিনী ভুলে গেছে। দেশকে ভালোবাসে বলে নলিনী বড়ো শ্রদ্ধা করত তাকে, নিজেকে উজাড় করে উন্মুখ অতল ভালোবাসায় তার জীবন ভরে রাখত। নলিনী ভুলে গেছে, আজও সে দেশকে ভালোবাসে। কত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছে, কত অল্পদিনে ! যুদ্ধ, বোমার ভয়, দুর্ভিক্ষ হাসিমুখে হেলায় পিছনে ঠেলে দিয়েছে, কীসের সমস্যা কীসের কী, তুমি আছ আমি আছি ! একটি মেয়েকে জন্ম দিতে সব ভুলে গেছে নলিনী। কলকাতায় তখন

দাঙ্গা। চারিদিকে বিদ্রোহ-হাঙ্গামা, তারপর বিভীষিকা। ভয়ে নয়, নলিনীর ভাবান্তর দেখে তাকে কণাদ ক-মাসের জন্য বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল !

তবু তাকে বাঁচিয়ে চলে কেন নলিনী ? রাত্রে কেন তাকে জানায় না ঘরে চাল নেই, সে না খেয়ে পেটের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে পাশে এসে শুয়েছে ? আদব করতে চেয়ে কাছে টানায় খানিকক্ষণ সে কাঠ হয়ে থেমে ছিল, হাত সরিয়ে দিয়েছিল। কত দুঃখ আর ক্ষোভের সঙ্গে নলিনীকে তখন তার মনে হয়েছিল স্বার্থপর, এখন নিজের সেই জ্বালার কথা ভেবে লজ্জায় কণাদের মরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতে সাধ যায়। সারাদিন খেটে মেয়েকে মাই খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে নলিনী শুয়েছিল অন্যদিনের মতোই, সে টেরও পায়নি যে তার একমুঠো ভাত জোটেনি। তারপর নিজেই নলিনী পাশ ফিরে তার গলা জড়িয়েছিল। এটাও তার নলিনীর স্বার্থপরতাই মনে হয়েছিল। সকালে এখন আকাশে সূর্য উঠেছে, নোংরা রাস্তায় মানুষের ঠাসাঠাসি ভিড়, বাজারে তার পাশে দাঁড়িয়ে নলিনীর মতোই রোগা ফোলা চোখ মুখ, আলুথালু কুৎসিত শিথিল ভঙ্গিতে শাড়ি জড়ানো বস্তির একটি সস্তা বেশ্যা আধপোয়া কুচো চিংড়ি কিনছে। ভগবান আছেন বলে আর ভরসা নেই কণাদের, সত্য আর আদর্শও হয়তো নেই তবু কণাদ নিজের কাছে স্বীকার করে যে এখনও নলিনীকে সে স্বার্থপর বলেই ভাবছে। নলিনী জানে তার জন্যই তার সব, বর্তমানের খাওয়া-পরা ও ভবিষ্যতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরাম বিরাম। তাকে শুধু বাঁচিয়ে রাখতে নলিনী তাকে রাত্রে চালের কথা না বলে তাকে ঘুমোতে দেয়, তাকে বেশি চটানো উচিত নয় ভেবেই উপোসি অবশ দেহটাকে পাশ ফিরিয়ে শীর্ণ হাত দুটিকে তার গলায় জড়িয়ে দেয় ! সে বাঁচলে, সে খুশি থাকলে তবেই নলিনীর স্বার্থ বজায় থাকবে।

কুচো চিংড়ি দেড় টাকা সের ! একদিন মাছ ছাড়া নলিনীর মুখে ভাত রুচত না। বেশিদিনের কথা নয়। দুধ-ঘি, পোলাউ-মাংস কে চায়, নলিনী বলত, জন্ম জন্ম তুমি শুধু আমাকে একটুকরো মাছ দিয়ে ভাত খাইয়ো—আমি হাতির মতো খাটব, এখন অর্ধেক মাস বাড়িতে আঁশটে গন্ধ ঢোকে না। এ নালিশও নলিনী ভুলে গেছে।

ধরুন—বাবু, একপো।

দাঁড়াও বাছা, কণাদ চিন্তার ভান করে,অভিনয়ের ভঙ্গিতে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে, বেলা হয়ে গেছে, চিংড়ি বাছবে কে ? তার চেয়ে বরং—

মেছুনিও হাসে, বলে, ইলিশ পোনা নাও বাবু, কে বারণ করছে ?

খুচরো টাকাপয়সা ছিল না, দশ টাকার একটা নোট নিয়ে বাজারে এসেছে। হায় রে রোমাঞ্চকর অভিজাত দশ টাকার নোট ! পাঁচ সের চোরাবাজারি চাল কিনতেই তার চারটে টাকা খরচ হয়ে গেছে। মাসের প্রথম সপ্তাহ পার হয়ে গেছে, তবু পকেটে টাকা আছে বলেই কি কণাদ আজ ছ আনার কুচো চিংড়ি বদলে পাঁচসিকে দিয়ে বাচ্চা একটা ইলিশ কিনবে ? এটা কি উচিত ? এমন ঝোঁকের মাথায় কাজ করা ? ইলিশের দাম দিতে দিতে কণাদের মনে পড়ে বহুদিন আগে, বছর পনেরো আগে প্রবাসীতে একজন কেরানিকে নিয়ে লেখা একটা গল্প পড়েছিল। প্রবাসীর গল্প প্রতিযোগিতায় তৃতীয় অথবা চতুর্থ পুরস্কার পেয়েছিল গল্পটা, বোধ হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। দেশের জন্য চাঁদা তুলতে বেরিয়েছিল শোভাযাত্রা, তারই মতো অভাবগ্রস্ত এক কেরানির প্রাণটা আকুল হয়েছিল চার আনা চাঁদা দিতে চেয়ে। খুচরো ছিল না, শুধু একটা দশ টাকার নোট। বোধ হয় বাকি মাসটা সংসার চালাবার শেষ সম্বল। তার সামান্য দান ফেটে নিতে বলে বাকি টাকা ফেরত চেয়ে নেবে ভেবে নোটটা সে বাড়িয়ে দিয়েছিল, দেখে জয়ধ্বনি করে উঠেছিল ছেলেরা। মনের চাপা আগুন কিন্তু তার দিন চালানোর চিন্তা, দশটা টাকার প্রাণান্তকর মায়া ভুলিয়ে দিতে পারেনি। জীবনে হয়তো সেই প্রথম ও একমাত্র জয়ধ্বনিকেও সে দশটাকার একটা নোট দিয়ে কিনতে পারেনি। মাথা হেঁট করে জানিয়েছিল যে পুরো নোটটা সে দেয়নি, অন্তত ন-টা টাকা তার ফেরত চাই।

তখন সে ছাত্র, চরকা মানে, খদ্দর পরে। আদর্শের চেয়েও জগতে বড়ো কিছু থাকতে পারে, বাস্তব অবস্থার ফেরে পড়া কোনো একটা মানুষেব দশটা টাকার মায়া ছাপিয়ে উঠতে পারে মনের চাপা আগুনকে, তখন এ কথা ভাবতেও গা তার লজ্জায় ঘৃণায় শিউরে উঠত। লেখককে সে অভিশাপ দিয়েছিল। স্বাধীনতার অভিযান চলছে, সারা দেশে বিরাট ব্যাপক আন্দোলন, শোভাযাত্রা আর ছেলেদের জয়ধ্বনি করে ওঠার মতো নাটকীয় অবস্থায় সাময়িক একটা ঝোঁকও চাপল না কেরানিটির যে যাক যাক, দেশের জন্য যাক আমার দশটাকার নোটটা ? গুনে গেঁথে সে ফিরিয়ে নিল ভাঙানি টাকা ! দুঃখ-দুর্দশার, অভাব-অনটনের, বাস্তবতাব নামে কী কুৎসিত অপপ্রচার—মানুষের হৃদয়াবেগের চেয়ে টাকাকে বড়ো করা !

আজ সেও দশ টাকার একটা নোট নিয়েই সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে চালের চোরাবাজার হয়ে মাছ-তরকারির চোরাবাজারে এসেছে। আজ আব দশটা টাকার নোটে কেবানিব দেশপ্রেমকে ঘায়েল করার জন্য পনেরো বছরের পুরানো সেই গল্পেব লেখককে গাল দিতে সাধ যায না। কী যেন চাপা ছিল সেই ত্যাগের মন্ত্রে গড়ে তোলা দেশপ্রেমেব মধ্যে, একটা মস্ত মিথ্যা বিরাট ফাঁকি ; যাব ফলে ভাবের ঘরের আবেগের বন্যা মাটির পৃথিবীতে নামলেই শুকিয়ে যেত। যাবা ফেনিয়ে তুলত সে আবেগ, অপবিত্র মাটির পৃথিবীর বাস্তব মানুষ তাকে অশুদ্ধ প্রাণেব জ্বালায় বদলে নিয়ে বুদ্ধ চৈতন্যের তুচ্ছ ত্যাগের চেয়ে ঢের বড়ো ত্যাগ ঘর-সংসাব সুখ শান্তির সঙ্গে জীবনটা পর্যন্ত দান করতে মেতে উঠলে তারাই রাশ টেনে ধবত—আকাশে ছড়ানো মহান বাষ্পরাশির মোহ কাটিয়ে জীবনের বিরাট ইঞ্জিন প্রাণেব আগুনে কঠিন প্রতিজ্ঞার ইস্পাতে আটক নিজের বাষ্পেই দুর্দান্ত চাপ সৃষ্টি কবে চাকা ঘুরিয়ে চলতে আরম্ভ করলেই ওই ফাঁকিব সেফটি ভাল্‌ভ খুলে হুস করে বার করে দেওয়া হত শক্তির চাপ, অনড় নিশ্চল হয়ে যেত গতি। শোভাযাত্রার ছেলেরা জযধ্বনি কবে উঠলেও কেন সেই কেরানি ফিরিয়ে নেবে না ভাঙানি ? তাব দেশপ্রেমের জগতের সঙ্গে তো যোগ ছিল না তাব ওই দশটা টাকায় বাকি মাস সংসার চালাবার জগৎটার ! এ জগতের ত্যাগ সে কী করে পৌঁছে দেবে আর এক জগতে, কী করে সে ভাববে যে দেশের জন্য ত্যাগ করার সঙ্গে তার অচলপ্রায় কষ্টকর জীবনযাত্রা চালু হবাব যোগ আছে ?

বাজারে ভাপসা বাতাসে পচা মাছের গন্ধ। পচা মাছ চালানও আসে বাজাবে, বিক্রিও হযে যায়। দাম একটু সস্তা। তার দেশপ্রেম থেকে কি এমনই পচা গন্ধ পায় নলিনী ?

# পথান্তর

অতুলের মনে হয়, সে স্বপ্ন। অথবা সিনেমার সস্তা ঘটনা সত্যই অভিনীত হচ্ছে তার জীবনে ? নইলে এমন উদ্ভট, অবাস্তব, অর্থহীন অবস্থা কখনও মানুষের জীবনে সৃষ্টি হয় ? বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে বন্যা-পীড়িতদের সেবা করতে এসেছে এটা অসাধারণ কিছু নয়, আদর্শ নিয়ে বাপের সঙ্গে কত ছেলেই কলহ করে। কিন্তু টিলায় বসে কর্তব্য সম্বন্ধে রাসমণি আর রাখহরির সঙ্গে পরামর্শ করতে করতে নিশান দেখিয়ে সতর্ক করছে নৌকার মাঝিদের কোনদিকে ঘূর্ণাবর্তের বিপদ আর ঠিক সেই সময় তার নিজের বাপের বজরা ভেসে আসছে সেই ঘূর্ণাবর্তের দিকে !

রাখহরি অস্বীকার করছে নিশান দেখিয়ে বজরার মাঝিকে সতর্ক করতে ! ঘূর্ণাবর্তে পড়ে বজরা মারা যাক।

রাসমণি জোর দিয়ে বলে, রাখহরি, তুমি বুঝতে পারছ না। একটা রাঘব চৌধুরীকে মেরে আমাদের কী হবে ? ওর জায়গায় আর একজন রাঘব চৌধুরী আসবে। তুমি নিশান দেখাও !

রাখহরি তবু ইতস্তত করে। এ যুক্তি সে বোঝে না। তারা তো মারছে না রাঘব চৌধুরীকে। মরতে চলেছে সে নিজেই। তারা শুধু তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে না। কেন করবে ?

বজরা এগিয়ে আসে। আর সময় বড়ো বেশি নেই। আর একটু দেরি হলে ঘূর্ণির কবল থেকে বজরাটাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

অতুল শান্তকণ্ঠে বলে, তাছাড়া, রাখহরি, একটা কথা ভেবে দ্যাখো। বজরার মাঝি-মাল্লারা কী দোষ করেছে, রাঘব চৌধুরীর জন্য জন্য ওদের কেন প্রাণ যাবে ? একজনেব জন্য এতগুলি নির্দোষ মানুষকে তুমি মারতে দেবে ?

রাখহরি ঠোঁট কামড়ায়।

অতুল আবার বলে ওরা চৌধুরীর হুকুমে চলে। কিন্তু, চাকরি ওরা করে পেটের দায়ে।

রাখহরি তাড়াতাড়ি ভাঁজ খুলে নিশান তুলে ধরে। কিন্তু নিশান দেখাবার প্রয়োজন তখন এমন জরুরি যে গলা ছেড়ে হাঁকও সে দেয়। কথা না বুঝলেও আওয়াজটা বোধ হয় বজরার লোকের কানে পৌঁছায়।

বজরার মুখ ধীরে ধীরে ঘুরছে দেখা যায়। ঘূর্ণির স্রোতের টানে গিয়ে পড়বার আগেই দিক পরিবর্তন করে টিলার খানিক তফাত দিযে রাঘব চৌধুরীর বজরা চলে যায়।

রাসমণি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। অতুল নির্বিকারভাবে নিজেই রাখহরির কলকেতে একটু তামাক দিয়ে নারকেল ছোবড়ার আগুন জ্বালিয়ে নেয়। একটা পাতা গোল করে পাকিয়ে নলের মতো করে নিয়ে একটা মুখ কলকের তলায় লাগিয়ে আর একটা মুখ দিয়ে তামাক টানে। হাতে কলকে ধরে টান দেবার কায়দাটা সে এখনও ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারেনি।

কতকটা নিজের মনেই বলে, বজরাটা সদরে যাচ্ছে।

রাসমণি প্রশ্ন করে, কী করে জানলেন ?

রাখহরি তার জবাব শুনবার জন্য সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অতুল বলে, আমি জানি। সদরের কোর্টে ওর জরুরি দরকার আছে। ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন।

রাখহরি বলে, এত খপর কোথা পেলেন আপনি ?

অতুল বলে, তোমাদের কাছে আর গোপন করব না, আমিই রাঘব চৌধুরীর ছেলে।

রাখহরি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে অতুলের মুখের দিকে। কিন্তু রাসমণি বিশেষ আশ্চর্য হয়েছে মনে হয় না। বরং অতুলের এই সহজ স্বীকারোক্তিতে তার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি দেখা দেয়। সে বলে, আমি জানতাম। আপনাকে দেখেই চিনেছিলাম।

বলেননি কেন ?

আমার কী গরজ ? আপনার কোনো খারাপ মতলব আছে টের পেলে অবশ্য ফাঁস করে দিতাম কিন্তু আপনি যদি পরিচয় ভাঁড়িয়ে এদের ভালো করতে চান সে আপনার বিবেচনা। আমার কী বলার ছিল ? আমি ভেবেছিলাম, রাঘব চৌধুরীর ছেলে বলে পরিচয় দিতে আপনার বোধ হয় লজ্জা হচ্ছে।

আপনি কেন বাপ তুলে গাল দিলেন।

দিলাম কি ?

দিলেন বইকী। আমি কার ছেলে তাতে আমার লজ্জা বা গৌরবের কী আছে ? বাপের পরিচয়ে তো আমার পরিচয় নয়। আমি কী, আমার পরিচয় হল তাই।

বাপের ধারা তো মানুষ পায়।

পায় বইকী। আমি যে বাপের গোঁ-টা পেয়েছি তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। বাপের কাছে মানুষ হলে অন্য ধারাগুলিও হয়তো পেতাম। কিন্তু আমায় মানুষ করেছে অন্য লোকে, আমি মিলেছি অন্য জগতের অন্য জাতের মানুষের সঙ্গে। পরিবেশের ধারা মানুষ বেশি পায় সেটা ভুলছেন কেন ?

রাসমণি হেসে বলে, ভুলিনি। ভোলার জো আছে কি ?

অতুল কলকেটা এগিয়ে দেয়, রাখহরি কিন্তু হাত বাড়ায় না। মুখে একটা অদ্ভুত ভাব এনে সে এতক্ষণ চুপচাপ দুজনের কথা শুনছিল, এবার ঝাঁঝালো গলায় বলে, রাঘব চৌধুরীর ছেলে আপনি ? মোদের সাথে আপনি কেন বাবু ?

আমি তোমাদেরই একজন।

রাঘব চৌধুরীর ছেলে মোদেরই একজন ! পশ্চিমে সূর্য উঠবে তাহলে। নৌকা আসছে, আপনি যান বাবু চলে। আপনাকে মোদের দরকার নেই।

রাসমণি তাকে ধমক দিয়ে বলে, বাখো, তুমি যেমন গোঁয়ার, তেমনই বোকা। শুনলে না রাঘব চৌধুরী ওঁকে ত্যাজ্যপুত্র করতে গেছে ? জান না, তোমাদের দলে ভেড়ায়, ওর বাপের এত রাগ ? বুঝে কথা বলো, বুঝে কাজ করো।

রাখহরি মুখ বাঁকিয়ে হাসে। ত্যাজ্যপুত্তুর করল তো কী ? আজ ত্যাজ্যপুত্তুর কাল ঘরে টেনে নেবে ! বলে খানিক তফাতে সরে পেছন ফিরে বসে রাখহরি আপন মনে বিড়বিড় করতে থাকে।

অতুল রাসমণিকে বলে, থাক, আর কিছু বলবেন না ওকে। ওদের সন্দেহ আর অবিশ্বাস হবে, কথায় তা যাবে না। ওদের চিঁড়ে অত সহজ কথায় ভেজে না।

এদের খানিকটা চেনেন দেখছি।

একে একে তিন চারটি নৌকা এসে টিলার গায়ে লাগে। এরা চারিদিকের খবর নিয়ে আসছে, কোথায় বন্যার প্রকোপ কী রকম। কয়েকটি গ্রামের খবর এরা দেয়, যেখানে জল কম হয়েছে আর চারিদিক থেকে দুস্থ নরনারী ও গৃহপালিত পশুরা যেখানে আশ্রয়ের খোঁজে এসেছে। বন্যার কবল থেকে তারা বেঁচেছে কিন্তু আশ্রয় পাচ্ছে না। এ সব গ্রামের অধিবাসীদের অবস্থাও সুবিধে নয়, ভবিষ্যতে কী হবে কেউ ভেবে পাচ্ছে না, নিজেরা কী করে বেঁচে থাকবে সেই ভাবনাতেই তারা ব্যাকুল, অন্যকে আশ্রয় দিতে কেউ ভরসা পাচ্ছে না। পীরপুর বড়ো গ্রাম। বন্যায় পীরপুরের ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে কম, বাইরে থেকে লোকও সেখানে এসেছে বহু। তাদের খাওয়া জুটছে না, অনেকে অসুখে ভুগছে।

অতুল জিজ্ঞেস করে, পীরপুর যেতে কতক্ষণ লাগবে রসুল।

ঘন্টা তিনেক।

তাহলে আমরা পীরপুরে প্রথম গিয়ে কাজ আরম্ভ করি ! আপনি কী বলেন ? তুমি কী বলো রাখহরি ?

রাখহরি শুধু চোখ তুলে তাকায়, কথা বলে না।

রাসমণি বলে, তাই চলুন। রাখহরি কোনো কথা বলে না কিন্তু তাদের সঙ্গে রসুলের নৌকায় গিয়ে ওঠে।

নৌকায় যেতে যেতে বন্যা-পীড়িত গ্রাম দেখা যায় কাছে ও দূরে। কত ঘর ভেঙে পড়েছে, ভেসে গিয়েছে, যে ঘরগুলি দাঁড়িয়ে আছে তার চালায়, গাছের ডালে আর মাচায় আশ্রয় নিয়েছে নিরাশ্রয় মানুষ, এদের জন্যও ব্যবস্থা করতে হবে যত তাড়াতাড়ি পারা যায়। কিন্তু এখন অবিলম্বে কিছু করবার ক্ষমতা তাদের নেই। পীরপুরে শুরু করতে হবে। সদরে গিয়ে রিলিফের আন্দোলন ও ব্যবস্থা শুরু করতে হবে। সম্ভব হলে পীরপুরে কেন্দ্র করে সেখান থেকে চারিদিকে এ সব গ্রামে সাহায্য পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। নয়তো কাছাকাছি সুবিধামতো অন্য কোথাও কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। নৌকার ধারে বসে ঘোলা জলের স্রোতের দিকে চেয়ে অতুল স্তব্ধ হয়ে বসে এই সব কথা ভাবে, রাসমণি মাঝে মাঝে চোখ ফিরিয়ে তার মুখের দিকে তাকায়। মৃতদেহ ভেসে যায় নৌকার পাশ দিয়ে, মানুষের, গোরু-ছাগলের, কুকুরের। দেখে রাসমণি শিউরে ওঠে, কিন্তু অতুলের মুখের ভাবের কোনো পরিবর্তন হয় না। সে জানে এ দেশে মরণ কত সস্তা।

পীরপুরে পৌঁছে দেখা যায়, রসুলদের কাছে যে বর্ণনা শোনা গিয়েছিল, অবস্থা তার চেয়ে গুরুতর। প্রায় হাজার খানেক নিরাশ্রয় লোক এখানে এসে জড়ো হয়েছে, হাটের চালা, গোয়ালঘর, গাছতলা, মাটির পথের বাঁধ, যে যেখানে পেরেছে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের বেশির ভাগের মাথার ওপরেই খোলা আকাশ, অধিকাংশই উপবাসী। গাঁয়ের লোক কিছু কিছু চাল ডাল দিয়েছে কিন্তু তা যৎসামান্য। তাদের নিজেদের সঞ্চয় নেই, তারা কোথা থেকে দেবে ?

ঘুরে ঘুরে অতুল চারিদিকের অবস্থা দেখে বেড়ায়, লোকজনের সঙ্গে কথা বলে। লোকে কিন্তু তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়, এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে। পীরপুরে সে পা দেবার অল্পক্ষণের মধ্যেই কী করে চারিদিকে খবর ছড়িয়ে গেছে যে রাঘব চৌধুরীর ছেলে এসেছে গাঁয়ে। এমনই নামের মহিমা রাঘব চৌধুরীর যে খবর শুনেই সবাই রীতিমতো ভড়কে গেছে।

রাসমণি ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, এর চেয়ে গোপন রাখলেই পারতেন পরিচয়টা।

কপালের ঘাম মুছে অতুল শান্ত, প্রায় সস্নেহ কণ্ঠে বলে ভাবছেন কেন ? সব ঠিক হয়ে যাবে।

লোকের কাছে তার অনাদরে রাসমণির ক্ষোভটা তার বড়ো ভালো লাগে। তার শ্রান্ত কোমল মুখ দিয়ে কেমন মায়াও সে বোধ করে। কিন্তু একটু বিশ্রাম করে নিতে বলার ইচ্ছাটা মনেব ওপর চোখ রাঙিয়ে দমন করে ফেলে।

জিজ্ঞাসা করে করে জানা যায় যে গাঁয়ের একজনের কাছে মরাই-ভরা প্রচুর ধান আছে, তার নাম যোগেন সাউ। পীরপুরের সে ইজারা ভোগ করে রাঘব চৌধুরীর কাছ থেকে।

অতুল বলে, ওর মরায়ের ধানগুলিই তবে বার করতে হবে।

ধান ও দেবে না বাবু।

এমনি না দিক, বেচবে তো।

একমুঠো ধানও বেচবে না।

দেখাই যাক বেচে কী না। ওর মরাই-ভরা ধান থাকবে আর এতগুলো লোক না খেয়ে মরবে, তা তো হয় না।

রাসমণি জিজ্ঞেস করে, কী করবেন ?

চলো না যাই।

রাসমণি চকিতে তার দিকে তাকায়। কিন্তু অতুলের মুখ দেখে বোঝা যায় তাকে যে এই প্রথমবার সে তুমি বলেছে এটা তার খেয়াল আছে।

যোগেন সাউয়ের কাছে সে ধান জোগাড় করতে যাচ্ছে শুনে অনেক লোক তার পিছু নেয়, কিন্তু সঙ্গে না গিয়ে একটু তফাতে থাকে। যোগেন সাউ কম ধড়িবাজ শয়তান লোক নয়।

যোগেন সাউ লোকটা বেঁটে, মোটা, গায়ে শ্বেতির ছাড়া ছাড়া দাগ, মাথায় টাক। বয়স প্রায় চল্লিশ। অতুলের পরিচয় পেয়েও উচ্ছ্বসিত সংবর্ধনা জানাবার কোনো লক্ষণ তার দেখা যায় না। সবিনয়ে শুধু বলে. চৌধুরী মশায়ের ছেলে আপনি ? বেশ, বেশ।

অতুলের প্রস্তাব শুনে সে বলে, ধান কিনে নেবেন ? তা ধানের দামটা কে দেবে ?

আমি দেব।

আপনি দেবেন ?

দেব। আমার যা কিছু আছে সব এদের জন্য দিয়ে দেব। আপনার ধানের দাম হিসাব করে খত লিখে দিচ্ছি, সাত দিনের মধ্যে টাকা পাবেন।

যোগেন সাউ একটু ভড়কে যায়। এ বন্যার সুযোগে ধানের দর সে হাউইয়ের মতো আকাশের কোথায় চড়িয়ে দিতে পারবে সেই কথাটাই সে ভাবছিল, এর কাছে সে দর নেওয়া যাবে না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, যাকগে ছোটোবাবু, ও সব হাঙ্গামা আমি জানি না। তা ছাড়া, ধান আমি বেচব না।

ধান আপনাকে বেচতেই হবে।

বটে ? আমার ধান—

এতগুলো প্রাণ যে ধানে বাঁচবে, সে ধান আপনার নয়। ধানের ন্যায্য দামটা আপনার হতে পারে বটে, যদিও তাও হওয়া উচিত নয়। ন্যায্য দাম পাবেন, ধান ছেড়ে দিন। কথা বাড়াবেন না।

ন্যায্য দামটা কত ?

বন্যার আগে খোলা বাজারে যে দাম ছিল।

আমি দেব না। এ কি জবরদস্তি নাকি ?

জবরদস্তি নয়, ন্যায় বিচার। ধান আপনি দেবেন, ধান আমরা নেব, নিতেই হবে আমাদের— এর জন্য কেন মিছে জোর জবরদস্তি করছেন ?

মুখ ফিরিয়ে অতুল রাখহরিকে বলে, ওদের ডাকো তো রাখহরি, ধান বার করে মাপুক। ভয় নেই সাউ মশায়, আমি নিজে দাঁড়িয়ে মাপাব, এদিক ওদিক হবে না।

যোগেন সাউ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মুখ ফিরিয়ে অতুল দেখতে পায়, রাসমণি সজল চোখে তার দিকে চেয়ে আছে।

কিন্তু রাখহরি ? সবাই তার ত্যাগে উদারতায় মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়েছে, রাখহরি কি এখনও তাকে বিশ্বাস করবে না ? তার নির্বাক উদাসীনভাব ঘুচবে না ?

তখন ধান মাপা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, রাখহরি হঠাৎ বলে, মোর একটা ভুল হয়েছিল ছোটোবাবু।

অতুল তৎক্ষণাৎ খুশি হয়ে প্রত্যাশার সুরে বলে, কী ভুল রাখহরি ?

রাখহরি বলে, এ সব রিলিফ-টিলিফের কাজ তোমরা বাবুরা ভালো পার, এটা খেয়াল ছিল না বটে। তোমাদের এ শখ কিছু দোষের নয় কো মোটে।

# সিদ্ধপুরুষ

সেদিন বিজয়া দশমী। সকালে তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে নিখিল প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় চাপরাশি কানুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। সে যাবে হালিয়ায় অজিতদের বাড়ি। হালিয়া মাইল পাঁচ-ছয় দূর হবে শহর থেকে, কিছু পথ নৌকায় গিয়ে বাকিটা হাঁটতে হবে।

পূর্ববাংলায় এই মহকুমা শহরে নিখিলেরা এসেছে অল্পদিন। তার বাবা শহরের বড়োদরের হাকিম। তালুকদার শশাঙ্ক চক্রবর্তীর ছেলে অজিতের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কী করে যেন খুব ভাব হয়ে গেছে নিখিলের ! এক ক্লাসে পড়ে অবশ্য তারা, কিন্তু তাতেই কি ভাব হয় ? সম্ভবত দুপক্ষের কৌতূহল। অজিতের বাবা বেশ বড়োলোকও বটে কিন্তু একেবারে সেকেলে গেঁয়ো বড়োলোক। হালিয়া গ্রামে টিন আর খড়ো সেকেলে বাড়িতে একগাদা আত্মীয়স্বজনকে সঙ্গে নিয়ে বাস করে, এত কাছে শহরে এসে একটা দালান তুলে একা থাকবে এটুকু শখও নেই। অজিতের বেশভূষা চালচলনও গেঁয়ো গেঁয়ো। আজকাল স্মার্ট হবার কিছু কিছু চেষ্টা সে আরম্ভ করেছে বটে কিন্তু সে চেষ্টা পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে কেমন গেঁয়ো ধাঁচের।

তাই, নিখিলের মতো ধোপদুরস্ত ছেলে এমন গলায় গলায় ভাব করবে তার সঙ্গে এটা একটু খাপছাড়া মনে হয়েছে অনেকের।

অজিতদের গাঁয়ের বাড়িতে প্রতিবছর খুব সমারোহের সঙ্গে পূজা হয়, এবার বিশেষ বন্ধু নিখিলকে সে বিশেষভাবে নেমন্তন্ন করেছে তাদের ওখানে যাবার জন্য। বন্ধুর নেমন্তন্ন রাখতেই নিখিল আজ রওনা হয়েছে, আজকের দিনটা ওখানেই থাকবে।

অজিত তাকে একেবারে পুজোর কয়েকটা দিন তাদের ওখানে কীভাবে কাটে তার বিবরণ শুনিয়ে রেখেছে, নিখিলের আশা হয়েছিল এবার নতুন রকমের হইচই করে পুজোটা কাটবে। চাররাত্রি যাত্রা, মহিষ বলি, ঢুলির নাচের লড়াই, মেলা এ সব উপভোগ করবে নিখিল, কোনোদিন চোখেও দেখেনি এমন সব নতুন নতুন জিনিস খেয়ে দেখবে এ দেশের। তার কোনো অসুবিধা হবে না, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করবে অজিত।

নিখিল খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল কিন্তু তার এ উৎসাহে বাড়ির মানুষ গোড়ায় একেবারেই সায় দিতে চায়নি। বাংলাদেশের রোগেভরা অস্বাস্থ্যকর গাঁ, চারিদিকে জলকাদা, গেঁয়োলোকের বাড়িতে থাকা-খাওয়ার নোংরা ব্যবস্থা, তাতে আবার লোক গিজগিজ করবে পুজো উপলক্ষে। এর মধ্যে ছেলে গিয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে দিয়ে আসতে চায় শুনেই তারা সভয়ে ও সজোরে মাথা নেড়েছিল।

অনেক লড়াই করে মাত্র কাল নিখিল তাদের অনুমতি আদায় করেছে যে শুধু আজকের রাতটা সে হালিয়ায় কাটাতে পারবে। তাও মন্দের ভালো। মেলা আর ঢুলির লড়াইটা দেখতে পাবে। রাত্রে যাত্রাও আছে।

নদী থইথই করছে জলে। ঘণ্টা তিনেক চলে নৌকা এক গাছপালাভরা গাঁয়ের কাছে ভিড়ল। আরও কয়েকটি নৌকা সেখানে বাঁধা ছিল।

তীরে নেমে নিখিল জিজ্ঞেস করল চাপরাশিকে, হালিয়া কতদূর এখান থেকে ?

চাপরাশি সোৎসাহে বলল, এই তো হালিয়া, দেখা যাচ্ছে।

মাঝিরাও সায় দিল সমস্বরে যে হালিয়া গ্রাম কাছেই, ঘরবাড়ি পর্যন্ত দেখা যায় গাছপালার ফাঁকে !

পুরো আধঘণ্টা হেঁটেও কিন্তু হালিয়া পাওয়া যায় না। চাপরাশি আবার বলে, ওই তো হালিয়া বাবু !

কী আর করা যাবে। চাপরাশির গালে অবশ্য নিখিল একটা চড় কষিয়ে দেয়, কিন্তু কিল চড় খাবার অভ্যাস চাপরাশির আছে। তাতে হালিয়া তো হালিয়া হবে না। আবার সে পা চালায় হালিয়ার উদ্দেশে।

নৌকো থেকে নামতেই চারটে বেজেছিল। হালিয়া পৌঁছুতে সন্ধ্যা হবে সন্দেহ নেই। চলতে চলতে পা টা সুড়সুড় করে নিখিলের সামনের চাপরাশিকে বলের মতো একটিবার শুট করার জন্য। নরম নরম কাদা কাদা মেটে পথ। সবে কিছুদিন গাঁয়ের পথঘাট জলের তলা থেকে মাথা তুলেছে। অধিকাংশ মাঠ খেত এখনও জলময়। ছোটো ছোটো গাঁ পড়ছে পথে। বিসর্জনের বাজনা কানে আসছে কাছ ও দূর থেকে।

সন্ধ্যার পর নিখিল অজিতদের বাড়ি পৌঁছোল। পা দুটো তখন তার বেশ টনটন করছে। দু-তিনমাইল রাস্তা কী করে পাকা ছ-সাতমাইলের মতো দীর্ঘ হয় ভেবে মেজাজটা আরও বেশি বিগড়ে গেছে। নিখিল পেয়েছে প্রচণ্ড।

তখন প্রতিমা বার করার আয়োজন চলছে। সকলেই ব্যতিব্যস্ত। নিখিলকে দেখে খুশি হয়ে অজিত বলল, ভাসান দেখতে যাবি প্রতিমার সঙ্গে ?

সেই নদীতে ?

অজিত হাসল। এ অঞ্চলের প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় কাছেই কালোদিঘি নামে একটা মস্ত বিলে, নদী পর্যন্ত প্রতিমা যায় না। বিলের ধারেই মেলা বসে। বিসর্জনের পর সব ঢুলিরা সেখানে নাচের লড়াই দেখায়।

যাব। একটু জিরিয়ে নিই।

একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে বসিয়ে অজিত চলে যায়। তার বসবার সময় নেই। অতিথিকে কিছু খেতে দেবার কথাও সে বলে না। এখন কিছু খেতে নেই। প্রতিমা বিসর্জনের পর ফিরে এলে তখন কোলাকুলি আর খাবার ব্যবস্থা।

ঘরের অর্ধেক জুড়ে নিচু কাঠের চৌকিতে মস্ত ফরাশ বিছানো। ফরাশের মাঝখানে ছোটো কাঠের টুলে একটা লণ্ঠন, উপরে চালা থেকে আর একটা বাতি ঝুলছে। তার নীচে প্রকাণ্ড একটা পিতলের হাঁড়িতে কাঠের একটা দণ্ড দিয়ে একজন চাকর সবুজ রঙের কী ঘুঁটছিল। ঘরে আর লোকজন কেউ নেই।

ওটা কী ?

আজ্ঞে, শরবত।

কীসের শরবত ?

চাকর বোকার মতো একটু হাসল। একটু পরেই শরবত ঘোঁটা বন্ধ করে ঘরের কোণে হাঁড়িটা রেখে একটা থালা দিয়ে ঢেকে আর একবার নিখিলের দিকে চেয়ে আর একটু হেসে সে ঘর থেকে চলে গেল।

বাদাম পেস্তা দিয়ে বানানো শরবত নিশ্চয়। কী গাঢ় সবুজ রং ! খেতে কেমন লাগবে কে জানে। পুষ্টিকর যে হবে তাতে সন্দেহ নাই। এক গ্লাস চেয়ে নিয়ে খেলে হত।

মণ্ডপে প্রচণ্ড শব্দে ঢাক ঢোল কাঁসি ঘণ্টা বাজছে, লোকজন গলা ফাটিয়ে চেঁচামেচি করছে। বড়োই শ্রান্তি বোধ করে নিখিল। ক্ষুধাতৃষ্ণা নাড়া দিয়ে দিয়ে ওঠে ভেতরে। তৃষ্ণাটা এখন যেন বেশি

জোরালো হয়েছে। ঘরের বেড়া ঘেঁষে একটি কুঁজো বসানো ছিল, গলায় উপুড় করা একটি কাঁচের গ্লাস। গ্লাসে জল খাওয়া যায়।

শরবতও খাওয়া যায়।

এক হাঁড়ি শরবত থাকলে জল কেন খাবে ? গাঢ় সবুজ পেস্তা বাদামের খাসা শরবত। বন্ধুর বাড়িতে না বলে একটু শরবত খেলে এমন কিছু গুরুতর অপরাধ হবে না নিশ্চয় !

কাঠের দণ্ডটা শরবতের হাঁড়ির মুখে চাপানো থালাটার উপরেই ছিল। শরবতটা একবার ভালো করে ঘুঁটে সে গেলাস ভর্তি করে নেয়। গেলাসে চুমুক দিয়েই মনটা তার খুশিতে ভরে উঠে। সুন্দর স্বাদ শরবতের, চমৎকার গন্ধ। এমন শরবত জীবনে নিখিল কখনও চোখে দেখেনি। বেশ একটু ঝাল ঝাল মিষ্টি মিষ্টি ক্ষীর ক্ষীর মেওয়া মেওয়া খেতে, গলা দিয়ে নামবার পরেও যেন স্বাদটা জানান দিতে থাকে। তেজি শরবত !

গেলাস খালি করে নিখিল বলে, আঃ !

সে আর এক গ্লাস শরবত খায়।

খিদে আর তেষ্টা দুই মেটে সঙ্গে সঙ্গে, শ্রান্তি ক্লান্তি অল্পে অল্পে মিলিয়ে যায় শরীর মন দুয়েরই। বেশ তাজা মনে হতে থাকে নিজেকে, মনটা ভরে উঠতে থাকে জীবন্ত খুশির ভাবে। পৌঁছুতে একটু দেরি হয়েছে বলে, পথ একটু বেশি হাঁটতে হয়েছে বলে, পূজার আমোদটা যেন তার মাটি হয়ে গেল ভাবছিল সে ! কথাটা মনে করে নিখিল মুচকে হাসে।

আর একটু শরবত ঢেলে নিয়ে সে খায়। বেশি নয়, আধ গেলাস।

আলো বেশি উজ্জ্বল হয়েছে ঘরের। লণ্ঠনের লালচে আলোয় এমন আশ্চর্য চাকচিক্য থাকে নিখিল জানত না। খুব হালকা লাগছে শরীরটা। হুঁঃ, মা আবার বলে দিন দিন সে রোগা হয়ে যাচ্ছে, মা কী জানবে তার গায়ে কত জোর !

বাড়ির কথা ভেবে তার হাসি পায়। কী মজাটাই আজ সে করল ! ওরা সকলে সেজেগুজে মোটরে চেপে নদীর ধারে প্রতিমা বিসর্জন দেখতে যাবে, ওরা কি কল্পনা করতে পারবে সে কোথায় আছে, কী করছে ! ঢোলের বাজনার সঙ্গে সে আজ খুব এক চোট নেচে নেবে, প্রতিমার আগে সবাইকে যেমন নেচে যেতে দেখেছে চিরকাল, কিন্তু নিজে কোনোদিন নাচেনি।

মাথার মধ্যে কেমন কেমন করছে কেন সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কেমন কেমন করাটাও যে ঠিক কী রকমের সে ধারণা করতে পারে না। মাথার মধ্যে যা কিছু আছে, সেগুলো কী কে জানে, সব যেন একবার সরু আর একবার মোটা হচ্ছে, তারপরেই চ্যাপটা হয়ে পাটি গুটোনোর মতো গুটিয়ে যাচ্ছে নিজে নিজেই। বেশি ফুর্তি হলে বোধ হয় এ রকম হয়। হয়তো হয়, বয়ে গেল নিখিলের ! এত সব হাস্যকর ব্যাপারের মধ্যে আর একটা হাস্যকর ব্যাপার নয় ঘটলই তার মাথার মধ্যে !

ভেবে, এমন হাসি পায় নিখিলের যে শূন্য ঘরে আপন মনে হাসতে হাসতে সে বেদম হয়ে পড়ে।

হাসি থামে হঠাৎ। সামনে ঘরের শাল কাঠের খুঁটিটাকে এদিক ওদিক দুলতে দেখে। চোখ পাকিয়ে সে খুঁটিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে যেন কত ভালো মানুষ এমনিভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে খুঁটিটা, একটু নড়ে না পর্যন্ত। কিন্তু এদিকে সেই অবসরে মেঝেটা বেশ দুলতে আরম্ভ করে দেয় তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে।

এমন সময় ঘরে আসে অজিত। বলে, ইস, বড়ো দেরি হয়ে গেল প্রতিমা বার করতে। হাঙ্গামার আর শেষ নেই। যাবি না প্রতিমার সঙ্গে ?

যাব না, একশো বার যাব ! যাব বলে যাব, একদম—

উৎসাহেব আতিশয্যে তড়াক কবে লাফিয়ে ওঠে নিখিল। অজিত তাব মুখের দিকে চেয়ে ভড়কে গিয়ে বলে, কী হয়েছে তোর ?

কী হবে ? কিস্‌সু না।

অমন করছিস যে ?

নাচ শিখছি। ঠাকুরের সঙ্গে নাচব না ? দাঁড়া একটু শরবত খেয়ে নিই।

গেলাস নিয়ে নিখিল খানিকটা শরবত ঢালে হাঁড়ি থেকে, অর্ধেকটা পড়ে মাটিতে অর্ধেকটা গেলাসে।

খাবার সময় কশ বেয়ে শরবত পড়ে, বুকের কাছে জামা ভিজে যায়। অজিতের চোখ হয বড়ো বড়ো।

কতটা শববত খেয়েছিস নিখিল ?

কত আর, দু-তিন গ্লাস।

দু-তিন গ্লাস ! কী সর্বনাশ ! ও যে সিদ্ধিব শববত জানিস না ?

জানি না ? আমার সামনে বানালো, আমি জানি না ?

সিদ্ধি খাস তো তুই ?

নিখিল জীবনে কখনও সিদ্ধি খায়নি। কিন্তু সে হল আলাদা কথা। কে একজন একটা কথা জিজ্ঞেস করেছে, তার পিঠে কথা চাপিয়ে তাকে জবাব দিতে হবে, বাস। কীসেব মানে কী তা নিয়ে কে মাথা ঘামায !

কত খেয়েছি !—সে বলে অবজ্ঞাভরে।

শুনে অজিত একটু নিশ্চিন্ত হয। ব এ কিন্তু দেশি বুনো সিদ্ধি। এদিকে যেখানে সেখানে সিদ্ধি গাছ হয় দেখেছিস তো ? এ সেই সিদ্ধি, ভীষণ তেজ, আর খাস না কিন্তু।

নিখিলকে একটু চোখে চোখেই রাখে অজিত। কিন্তু কালো দিঘিব কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ তাকে আর সে দেখতে পায না। প্রতিমা নিয়ে সবাই তখন ব্যস্ত, অজিত নিজেও এদিক ওদিক তার খোঁজে একটু চোখে বুলিয়ে প্রতিমাব সঙ্গে যেতে বাধ্য হয। বিসর্জনেব পব খোঁজ কবা হয ভালোভাবে। কিন্তু কোথাও নিখিলের পাত্তাও মেলে না।

অজিত ভয পেয়ে ভাবে, সেরেছে !

নিখিল যখন চোখ মেলে তাকায়, বেশ বেলা হয়েছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে বুঝে উঠতে পারে না, সত্যসত্যই জেগেছে না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে ! ভাঙাচোরা এই কুঁড়েঘরেব মধ্যে সে কী করে এল, স্যাঁতসেঁতে মাটির মেঝেতে বিছানো চাটাইয়ে ময়লা দুর্গন্ধ এই ছেঁড়া কাঁথা গাযে দিয়ে কখন শুল ? দরজার ঝাঁপ খোলা, বাইরে উঠানে গামছা পবা কালো একটি লোক বাঁশের মাচায় কঞ্চি সাজাচ্ছে। এ তো অজিতের বাড়ি নয় !

উঠে বসবার চেষ্টা করতে গিয়ে মনে হয় গায়ে বুঝি একটুও জোব নেই। অনেকদিন যেন অসুখে ভুগছে এমনই বিশ্রী দুর্বল লাগছে শরীরটা, মাথার মধ্যে টনটন করছে। বাইরেও কী যেন জোরে সেঁটে আছে মাথার সঙ্গে। মাথায় হাত দিয়ে নিখিল চুল খুজে পায় না, মাটির মতো শক্ত কী যেন হাতে ঠেকে।

ভাবতে ভাবতে অজিতদের বাড়িতে গিয়ে খালি ঘরে বসে সবুজ রঙের শরবত খাওয়া পর্যন্ত মনে পড়ে নিখিলের, তারপরের আর কোনো কথাই মনে আসে না। সব ফাঁকা হয়ে থাকে।

পিঁ পিঁ আওয়াজ করে নিখিল উঠানের লোকটিকে ডাকে। লোকটি ঘরে এসে খুশিতে একগাল হেসে বলে, জেগেছ বাবু !

তুমি কে ? এটা কার বাড়ি ? আমি এখানে এলাম কী করে ?

তাকে কথা বলতে দেখে লোকটি যেন আরও খুশি হয়ে বলে, মাথা ভালো হয়ে গেছে বাবু ?

নাম তার শিবু। গরিব চাষি। দশমীর রাত্রে মেলা থেকে ফেরবার সময় রাস্তায় তাকে পাগলামি করতে দেখে সাথে করে বাড়ি নিয়ে এসেছে। তাদের গাঁয়ে ভালো গুণী আছে একজন, মাথাব ব্যারামের সুন্দর চিকিৎসা জানে ! তাকে দিযে চিকিৎসা করিযেছে।

আজ কী বার ?

বিষ্যুদ্‌বার !

দশমী ছিল সোমবার। সেই থেকে সে পাগল হয়ে ছিল আজ পর্যন্ত ! শিবু জানায, না, পাগল হয়ে সে থাকেনি। গুণীর ওষুধে ঘুমিয়েছে একটানা। মাঝে মাঝে দু-একবাব অল্পক্ষণের জন্য জেগে আবোল-তাবোল কথা বলেছে, তারপর আবার ঘুমিযেছে।

হালিয়া কত দূর এখান থেকে ?

পাঁচ-ছকোশ হবে।

তাকে শিবু পেয়েছিল এ গাঁয়েব কাছাকাছি, তখন মাঝবাত্রি পার হযে গেছে। হালিযা থেকে এত দূরে সে কী করে এসেছিল ওই অবস্থায় এ রহস্যের মীমাংসা নিখিল কোনোদিন কবতে পাবেনি।

আমার মাথায় কী ?

শিবু গর্বের সঙ্গে জানায়, ওই তো ওষুধ, গুণীর খাঁটি ওষুধ, হাতে হাতে ফল। মাথা নেড়া করে ওষুধ লাগিয়ে দেবার পর নিখিল ঘুমিয়ে ছিল, ঘুম যখন ভাঙল মাথা তাব ভালো হয়ে গেছে। নির্ঘাৎ ওষুধ নয় ?

মাথা নেড়া করে দিয়েছে। তখনকার মতো চুপ কবে থাকে নিখিল ! শিবুকে দিযেই শহবে বাবার কাছে খবর পাঠায়। শিবুর বউ দুধ গরম করে এনে দিলে এক চুমুকে দুধটাও শেষ কবে। তারপর লোকজন নিয়ে তার বাবা এসে পড়লে একটা মোটা কঞ্চি কুড়িয়ে নিযে পাগলের মতোই আথালিপাথালি পিটতে আরম্ভ করে শিবুকে।

শিবু, তার বউ আর গাঁয়ের সমবেত লোকেরা হাঁ করে তাকিযে থাকে। রাস্তা থেকে কুড়িযে এনে পরম যত্নে রেখে একজনকে সুস্থ করে তোলার কী অপূর্ব পুরস্কার !

# হ্যাংলা

বাজার সাপটে বড়োলোক হয়েছে মীর্ণার বাবা, বালিগঞ্জে বাড়ি করেছে চমৎকার আর্টিস্টিক ছাঁদে। সমস্ত বাড়িটা নয়, কেবল সামনের অংশটা—বাইরের মানুষরা যে অংশে আসে এবং পথচারী রাস্তা থেকে যে অংশ দেখতে পায়। ভিতরের অন্দর মহলে চারমহলা দুর্গা-বাড়ির পুরানো ঐতিহ্য খানিকটা ভদ্র সাজ করে হাজির আছে।

মীর্ণার বাবা জবরদস্ত লোক। অনেক টাকা আছে বলে নয়, বাড়ি করা, মোটর কেনা, মেয়েকে তিন শো টাকায় শাড়ি কিনে দেওয়া প্রভৃতি দরকারি বিষয়ে ছাড়া কদাচ টাকার অপচয় করে না বলে। এমন কী, সামনে দোয়ানো দুধ ভালো হচ্ছে না বলে বাপ-বেটিতে মিলে গোয়ালাকে শাসাতে পর্যন্ত পারে বলে। যে ফার্ম কন্ট্রাক্ট নিয়ে বাড়িটা তৈরি করেছিল তারা তাকে ঠকাতে সাহস করেনি। বিলামসন আর দাদা-ভাই লালভাই দুজনেরই সার্টিফিকেট দেখিয়েছিল। বিলামসনের বাড়ির সাঁইত্রিশটা ফ্ল্যাটের প্রত্যেকটাতে আলো-বাতাস যায, রাস্তা নজরে পড়ে ! দাদা-ভাই লালভাইয়ের সাততলা বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে আকাশকে দেখতে পাওয়া যায় একটা লম্বা চোঙার ঢাকনির মতো।

তাতে কাজ হয়নি। মীর্ণার বাবার আরও উঁচুতে প্রভাব।

সুলেখা, সুধা ও মীর্ণা এক কলেজে পড়ে। সুলেখা ও সুধা মিলের সাফ শাড়ি পরে কলেজে যায়। মীর্ণাব তো রং-বেরঙের শ-তিনেক শাড়ি সর্বদা মজুত আছেই—পুরানো দু-চারখানা বাতিল হতে না হতে নতুন পাঁচ-সাতখানা এসে জোটে। সুলেখা ইচ্ছে করে দুবার এবং মীর্ণা অনিচ্ছায় একবার ফেল করায় সুধা প্রত্যেকবার পাস করতে করতে এসে তাদের নাগাল ধরেছে।

শহরতলিতে সুলেখা ও সুধার বাড়ি, এক পাড়াতে এবং কাছাকাছি। দুজনের এক ধরনের ভাব হয়েছে কিন্তু ঘনিষ্ঠতা জন্মেনি। সুলেখা বারবার ফেল করায় সুধা তাকে একটু নিকৃষ্ট জীব মনে করে। সুলেখা সর্বদাই মৃদু মৃদু হাসি দিয়ে বেশি কথা বলার কাজটা চালিয়ে নিতে চায়, এটাও সুধার পছন্দ হয় না।

মীর্ণার নাগাল দুজনেই পায় না। মীর্ণা নিজেকে ওদের নাগালেব বাইরে বেখে দেয়। কলেজে দেখা হয়, কিন্তু না হয় দুটো মনের কথার বিনিময়, না জাগে এক সমতলে দাঁড়াবার অনুভূতি। জমকালো দেহ এবং জমকালো শাড়িতেও নির্বোধ অহংকার টলমল করে বলে মীর্ণা মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো চোখ দুটির কুটিল দৃষ্টিতে দুজনের দিকে তাকায়। সস্তা মিলের শাড়ির চেয়ে দামি সিল্কে যে মেয়েদের ভালো দেখায়, এই অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক সত্যে মীর্ণার রীতিমতো সন্দেহ উপস্থিত হয়।

মথুরামোহনের একটি খবরের কাগজ এবং একটি রাজনৈতিক দল আছে। সে নিজে এবং জনকয়েক অনুগত ছেলেমেয়ে এই নিয়ে তার দল এবং এতেই সে সন্তুষ্ট। কারণ, দলের গালভরা নাম, নিজের বক্তৃতার দাপট আর খবরের কাগজ, এতেই তার বেশ চলে যায়। হিসাব করে নিজের রাজনৈতিক ওজনটুকু সে ধারও দেয়, ভাড়াও দেয়। সুধার সাহায্যে মথুরা মীর্ণাকে বাগিয়েছে। সুলেখাও হাত লাগিয়েছে কিন্তু সে একটু গভীর জলের মেয়ে। তার হস্তক্ষেপ ধরতে পারেনি বলেই মীর্ণার কল্পনায় সেই রং চড়াতে পেবেছে বেশি। মীর্ণা চড়বড় করে উপরে উঠে নেতৃ স্থানীয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে অল্পদিনের মধ্যে। এখন সুধাকেই সে কাজের নির্দেশ দেয়। রীতিমতো শক্ত কাজ—যাতে অনেক খাটা এবং হাঁটা দরকার। সুলেখাকে কয়েকবার কাজের শাস্তি দেবার চেষ্টাও সে করেছিল, স্বয়ং মথুরামোহনের জন্য পারেনি।

ও পারবে না। মেয়েটা কোনো কাজের নয়। মথুর যেন কৈফিয়ত দিয়েছিল।

শিখতে হবে না ?

কী দরকার ? সকলকে বিশ্বাস করা যায় না।

ও ! বলে মৃদু হেসেছিল মীর্ণা !

সুধা খুব উৎসাহী। কোনো কাজে সে কখনও না বলে না। সে জানে, ভালো ওয়ার্কাব হিসাবে সে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এটা বজায় রেখে চললে বড়োরকম সুযোগ সুবিধা কোনোদিক থেকে জুটে যাবে। শুধু মীর্ণার প্রতি গভীর বিদ্বেষে তার গা জ্বালা করে। ও কেন এত উঁচুতে স্থান পেল ? মোটরে আসে যায়, বড়োলোকের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দেয়, বাড়িতে আজ পার্টি, কাল বসন্তোৎসব করে হাওয়ায় ভেসে দিন কাটায়। তাদের কখনও ডাকে না। তার সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত করতে চায় না।

একদিন বিনা আহ্বানে সুধা ওর বাড়ি গিয়েছিল—সন্ধ্যাবেলা। ড্রয়িংরুমে পাঁচ সাতটি ছেলেমেয়ে বসেছিল, দু-তিনজন সুধার মুখচেনা। সুনীলের সঙ্গে তো তার আলাপ পর্যন্ত আছে। কাগজের অফিসে একদিন অনেকক্ষণ সে তাকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছিল, বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনে তার সমস্ত কথার জবাব দিয়েছিল সুনীল। আর একদিন খুব অল্প সময়ের জন্য আলাপ হয়েছিল বটে কিন্তু সেদিন সুনীল রাজি হয়েছিল তার বাড়িতে একদিন চা খেতে আসবে, গবিব বলে অবহেলা করবে না। তারপর সে আর সুনীলকে এ পর্যন্ত একটা দিন স্থির করে নিমন্ত্রণ করাব সুযোগ পায়নি, কেমন যেন তাকে এড়িয়ে গেছে সুনীল। নিশ্চয় মীর্ণার কুপরামর্শে। কিন্তু মুটকি মীর্ণা ওকে আর কদিন ভুলিয়ে রাখতে পারবে, একদিন তার বাড়িতে ও নিশ্চয় আসবে চা খেতে।

কিন্তু সেই আলোকোজ্জ্বল সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে আধ মিনিট তাকে মীর্ণা দাঁড়াতে দেয়নি, কারও সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া তো অনেক দূরের কথা। পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে সোজা স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞেস করেছিল, কী চাই ?

এমনি আলাপ করতে এসেছি।

আর একদিন এসো।

আর একদিন এসো ! অপমানে বুক ফেটে গিয়েছিল সুধার। কেন আব একদিন আসবে ? আজ তাকে সকলের মধ্যে বসিয়ে চা আর ওই খাবারগুলির কিছু খেতে দিলে দোষ কী হত ?

আঘাতটা সমলে নিয়ে পরে সুধা মনে মনে হেসেছে। ওরা ওই রকমই হয়। ওরা বড়োলোকেব জাত—বজ্জাত। ওদের দিয়ে সমাজের কোনো কল্যাণ হতে পারে ?

সুলেখা বলে, তোমার অত হিংসা কেন ? তুমি তোমার কাজ করে যাও।

আমাদের মানুষ বলে গণ্য করবে না ?

নাই বা করল ? আমরাও ওকে মানুষ বলে গণ্য করব না। তাছাড়া, ওকে মথুরাবাবুর তেমন পছন্দ নয়।

নয় ? সুধা চমকে যায়।

সুধা কাজ করে, খুব ভালো কাজ করে। প্রতিদিন বিকালে সে তাদের আপিসে হাজির থাকে। বই পড়ে, অন্য ওয়ার্কারদের সঙ্গে কথা বলে আর উৎসুক দৃষ্টিতে লক্ষ করে কে আসছে আর কে যাচ্ছে। হঠাৎ একসময় সে একজনের পিছু পিছু বেরিয়ে যায়। রাস্তায় নাগাল ধরে বলে, বাড়ি যাবেন নাকি মোহনদা ?

মোহন বিব্রত হয়ে বলে, অ্যাঁ ? হ্যাঁ, বাড়িই যাব ভাবছি।

চলুন আপনার সঙ্গে ভবানীপুর পর্যন্ত যাওয়া যাক। পরিচয়টা আরও জমবে।

চলুন।

অবিশ্যি যদি আমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসেন।

মোহন ধীরে ধীরে বলে, বাড়িতে একটু কাজ ছিল।

এসপ্ল্যানেডে ট্রাম বদল করতে নেমে সুধা বিস্ময়কর স্বগতোক্তি করে, ওই যা, ভুলে গেলাম। সর্দি হয়েছে, একটু কফি খেয়ে যাব ভেবেছিলাম। কলেজ থেকে বেরিয়ে কিছু খাইনি—খিদেও পেয়েছে চনচনে।..... খাওয়াবেন তো বুঝলাম, আপনিও খাবেন তো ?

তা, বাড়ির অবস্থা সুধার তেমন ভালো নয়। কলেজের পর খিদে পেলে সস্তা কিছু খেয়ে কোনোরকমে পেট ভরাতে পারে—তাতে স্বাদ নেই, গন্ধ নেই, পুরুষ একজন সঙ্গীকে নিয়ে পাখার নীচে ভালো চেয়ারে গা এলিয়ে খাবার সুখ নেই।

সুলেখা বলল, এ সব বাদ দে ভাই।

সুধা বলল, তুই বড়ো হিংসুটি। ডেকে নিয়ে যায় তো আমি কী করব ? বেশি প্রশ্রয় তো দিই না।

তলে তলে কী চাল চালল সুলেখা সেই জানে, কদিন পরে মীর্ণা নিজেই সুধার কাছে প্রস্তাব করল, তার ছোটো বোনকে সে যদি পড়ায়, ত্রিশ টাকা করে সে পাবে।

সকালে একঘণ্টা আর বিকেলে একঘণ্টা। বাড়ি তোমার কাছেই, অসুবিধে হবে না। নিয়ম মতো মনোযোগ দিয়ে কিন্তু পড়াতে হবে। মথুরাবাবু তোমাব কথা বললেন তাই, নইলে—

তিরিশ টাকা ! মাসে শুধু তিবিশটা টাকা দুবেলা পড়ানোর জন্য ! এত টাকা খরচ করে মীর্ণা, তাকে পঞ্চাশ না হোক চল্লিশটা টাকা মাইনে দিতে পারে না সে ! মরুক গে, তিবিশ টাকাই সই। দু একখানা শাড়ি কেনা যাবে, হাত খরচেব ক-টা টাকা বেশি হবে—

তৃতীয় দিন সন্ধ্যাব পর মীর্ণাব ছোটো বোনকে সে অতি কষ্টে পড়াচ্ছে, বাড়ির সামনে মোটবেব পর মোটর এসে থামতে লাগল। আরও মিনিট কুড়ি পড়িয়ে মীর্ণাব ঘবে গিয়ে মুখে পাউডাব লাগিয়ে সে সোজা গিয়ে হাজির হল বসবার ঘরে। চেনা আধচেনা কয়েকজনের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করে সুনীলের পাশেব আসনে বসে পড়ল।

কই চা খেতে একদিন তো গেলেন না গরিবেব বাড়ি ?

পরদিন সন্ধ্যার পব সুলেখা কয়েকটা সরু গলিতে পাক দিয়ে একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ল। প্রেসে ছাপার কাজ চলবার দেযাল-কাঁপানো শব্দ হচ্ছিল। ছোটো একখানা ঘরে কাঠেব টেবিলেব সামনে একটি হাতল-ভাঙা কাঠের চেয়ারে বসে মাঝবয়সি একজন প্রুফ দেখছিলেন। তাকে কাগজ, মেঝেতে কাগজ, চারিদিকে কাগজের ছড়াছড়ি ! খবরেব কাগজেব অপিসের গন্ধে ঘরেব বাতাস ভরা। মুখ তুলে একবার চেয়েই মথুরা বলে, বোসো। কী খবর ?

সুধার খবর।

কী রকম দাঁড়াল ?

হ্যাংলা।

মুখ না তুলে গলায় বিস্ময় না ফুটিয়ে মথুরা বললেন, হ্যাংলা ? এ সব মেয়ে কজন হ্যাংলা বেরোয় শুনলে অবাক হয়ে যাবে। ছেড়ে দাও ওকে।

আমায় টাকাটা দিতে পারবেন আজ ?

টাকা ?

এবার মাথা তুলে মথুরা আর নামাল না—মীর্ণা টাকাটা দিচ্ছে না। ওর টাকাটা আদায় করিয়ে দাও, ডবল কমিশন দেব। সহজে হবে না, চাপ দিতে হবে। কী করবে বলে দিচ্ছি। সবাই যেন একটু

অবহেলার ভাব দেখায়। কথা বলতে আরম্ভ করলে কান না দিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা চালাতে হবে। ওয়ার্কাররাও যেন ডাকলে সাড়া না দিয়ে সরে যায়। দু-চারজন আসছি বলে চলে যাবে, আসবে না। মীর্ণা যেন বুঝতে পারে কাগজের টাকাটা তাড়াতাড়ি দেওয়া চাই। বুঝিয়ে বলে দিয়ো সকলকে।

প্রুফ দেখতে আরম্ভ করে বললেন, চা খাবে নাকি একটু ? আমায় কিন্তু এক কাপ দিয়ো।

দিন তিনেক পরে বাপের কাছে একটা চেক চেয়ে নিয়ে মীর্ণা বলে, তোমার ওই মথুরবাবু বড়ো হ্যাংলা বাবা।

# বাগ্‌দি পাড়া দিয়ে

ভর দুপুরে দুলে বাগ্‌দি নায়েবমশাই শ্রীমন্ত সরকারের ঘরের দাওয়ায় সাগ্রহ প্রতীক্ষায় বসে আছে। ছেলের মতো যত্নে পাশে তার পাকা বাঁশের লাঠিটি শোয়ানো। কত তেল আর কত স্নেহে পাকানো এই লাঠি, রক্তও যে মাখেনি কত্তাবাবুর হুকুমে বিদ্রোহী প্রজার মাথা ফাটিয়ে এমন নয়।

লাঠিটি হাতে নিয়ে দুলে সকালবেলা বাগ্‌দিপাড়া থেকে বেরিয়েছিল। কাছারিবাড়ি গিয়েছিল কত্তাবাবুকেই তার দুঃখ আর নালিশ জানাতে। জমিদার অনুকূল তার নিবেদন কানেও তোলেনি, তার গুরুতর কিছু বলার আছে টের পেয়েই হুকুম দিয়েছিল ; শ্রীমন্তর কাছে যা দুলে। যা বলতে চাস শ্রীমন্তকে বল। পরে আমি শুনবখন।

শ্রীমন্ত বলেছিল, কীরে দুলে ' বুড়ো বয়সে আবার কোনো ছুঁড়ির সাথে 'অঙ' (রং) করে ফ্যাসাদে পড়েছিস নাকি ? এখন বাবু আমি বড়ো ব্যস্ত। আমাব বাড়ি যা, পুবের বেড়াটা একটু ভেঙে গেছে সেরে দিগে যা ততক্ষণ। কাছারির কাজ সেরে আসছি, তোর নালিশ শুনব।

পুবের গাছেব মাথা ঘেঁষা সূর্য মাথার উপরে চড়া পর্যন্ত দুলে নায়েববাবুর বাড়িতে বেগার খেটেছে, বাগানের বেড়া সারিয়েছে। অন্য বাড়ি চুক্তি করে নিলে এ কাজের জন্য সে কম করে আট আনা মজুবি পেত। কিন্তু বেলগাছে দেবতা থাকেন দুলের, তিনি সর্বশক্তিমান ভগবান এবং সেই জন্যই দুলে বাগ্‌দিপাড়ায় প্রধান। ওই বেলগাছের দেবতা বা দৈত্যকে সে মানে বলেই জমিদাব আর নায়েব গোমস্তা তাকে পায়ের গোলাম হতে দিয়েছে, বাগ্‌দিপাড়ার প্রধান করেছে। বেগাব তাকে খাটতেই হবে। শুধু তাকে কেন, বাগ্‌দিপাড়ার সব মদ্দপুরুষকে খাটতে হবে।

অনেক বেলায় বাড়ি ফিরে শ্রীমন্ত বলেছিল, একটু বোস বাবা। চট কবে নেয়ে খেয়েনি, তারপর তোর নালিশ শুনব। তোদের ভালো করতে হারামজাদা আমি যে মারা গেলাম !

দুলে সেই থেকে দাওয়ায় বসে আছে। মাঝদিনের মাথার উপরের সূর্য ধীরে ধীরে পশ্চিমে ঢলতে আরম্ভ করেছে। তবু নীরবে বিনা প্রতিবাদে অপেক্ষা না করে তার উপায় কী। গ্রামের বাইরে যেখানে গোল হয়ে বাঁক নিয়েছে নদী সেইখানে ঘন বাঁশঝাড় জলাজঙ্গল ভরা জমিতে বাগ্‌দিপাড়া, সে পাড়ায় সে প্রধান। সেটা তো বেলগাছের দেবতা, জমিদাব আর নায়েববাবুর দয়াতে। তার রাজ্যে, ওই বাগ্‌দিপাড়ায়, আজ যখন বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তার যখন খটকা লেগেছে ব্রাহ্মণ জমিদার নায়েব ভগবান ইংরেজরাজ তাকে আর কতদিন প্রধান করে রাখতে পারবে, তখন এ ভাবে শ্রীমন্তর বাড়ি এসে বেগার খেটে ধরা না দিয়ে তার উপায় কী। তার রাজ্য যে যায় যায়।

কষ্টে তার মাথা ঘুরছে। আধেক দিন প্রতীক্ষা করাল, আধবেলার বেশি বেগার খাটাল, একমুঠো গুড়মুড়ি জল খেতে দেয়নি। বেলগাছের দেবতার মতোই এরা নিষ্ঠুর। আহা, নিষ্ঠুর বলে অত্যাচারী বলেই তো এরা দেবতা। তাই হবে !

ভুঁড়িতে আলগা করে লুঙ্গি আটকে হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে শ্রীমন্ত এসে জলচৌকিটাতে ধপাস করে বসে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, চটপট বল দিকি কী ব্যাপার। প্যানাস নি, এক কথায় বল। তোদের নালিশ শুনতে শুনতে প্রাণ বেরিয়ে গেল, হারামজাদা বজ্জাতের দল। ঘুম পেয়েছে বাবু আমার।

ঘরের ভেতর থেকে মেয়েলি কণ্ঠে দুলে ঘুমপাড়ানি ছড়া শোনে—

আয় রে ঘুম যায় রে ঘুম
বাগ্‌দি পাড়া দিয়ে,
বাগ্‌দিদের ছেলে ঘুমোয় জাল মুড়ি দিয়ে --

তবে তুমি ঘুমোবে যাও। নালিশ শুনে কাজ নেই।

শোয়ানো লাঠি হাতে তুলে দুলে উঠতে যাবে, ব্যাপার বুঝে সচেতন হয়ে শ্রীমন্ত হঠাৎ অত্যন্ত মিষ্টি গলায় বলে, রাগিস কেন ? তুই আর আমি কি তফাত? তুই আমার পুত্রতুল্য ! কী বলছিস বল।

বলব কী ? দারুণ অভিমানে লাঠি আবার শুইয়ে রেখে হাত জোড় করে দুলে বলে, একদল বদ বেজাত যারা কারখানায় কাজ করতে যায় না ? বাগ্‌দি-পাড়া ওরা নষ্টাৎ করে দিচ্ছে। কী বলে শুনবে ?

বল না শুনি।

বলে, মোরাও মানুষ। রাজা মানুষ, দেবতা মানুষ, বাবুলোক মানুষ, মোরাও মানুষ।

বলে তো হয়েছে কী ?

হয়েছে কী ? ঠাকুরথানের বাঁধ কাটতে চায়, এই হয়েছে ! ঠাকুরথানের অপমানের কথা উচ্চারণ করার জন্যই নিজের দু-কান মলে দুলে শিউরে ওঠে।

বলিস কীরে ! কবে কাটবে ?

অনেকে গুঁইগাই করছে, তাইতে হঠাৎ ভরসা পাচ্ছে না, নইলে কবে কেটে দিত। তবে রাতদিন জপাচ্ছে, ইয়াকে উয়াকে রাজি করাচ্ছে। বেশিদিন আর সামলানো যাবে মোর ভরসা নাই। তোমরা ইবারে বিহিত কর।

বাগ্‌দিপাড়া জলার কাছে, প্রায় জলার মধ্যে। প্রতিবছর বর্ষায় জল পাড়ায় ওঠে, আবদ্ধ জল পচতে পচতে এক আঙুল দেড় আঙুল সরতে সরতে আব এক বর্ষার আগে শুধু কিছুদূর তফাতে সরে যায় মাত্র। নিচু জমির স্বাভাবিক জলা, চারিদিকে জমি উঁচু, জলা ওখানে থাকবেই। পশ্চিমে জমি শুধু একটু কম উঁচু—আগে, বহুকাল আগে, ওইদিক দিয়ে জলার কিছু বাড়তি জল বেবিয়ে যেত, বর্ষার জল একেবারে পাড়া পর্যন্ত উঠত না। বহুকাল আগে, কতকাল আগে কারও আজ স্মবণ নেই, এক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী পশ্চিম দিকে এক জায়গায় হাত ত্রিশেক লম্বা, দশ-বারোহাত চওড়া এবং পাঁচ-ছহাত উঁচু একটি বেদি বানায়, ইট আর মাটি দিয়ে। তার নাকি স্বপ্নাদেশ হয় যে বাগ্‌দি সমাজের চিরদিনের কল্যাণের জন্য ওখানে শিবাই ঠাকুরের বেদি স্থাপন করতে হবে। এবং এমনই আশ্চর্য ব্যাপার, স্বপ্নাদেশের খবর শোনামাত্র জমিদার টাকা আর লোক দিয়ে নিজেই বেদিটা বানিয়ে দেয়। মহাসমারোহে বেদিতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয়, বাগ্‌দিদের মধ্যে নেশা উত্তেজনা আর উল্লাসের সীমা পরিসীমা থাকে না। সেই থেকে ওই ঠাকুরের থান তাদের সমস্ত ধর্মকর্ম সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এবং সেই থেকে বর্ষাকালে জলার বাড়তি জল ঠাকুরের থান ডিঙিয়ে যেতে না পেরে পাড়ার মধ্যে ঘরের মধ্যে ঢুকতে শুরু করেছে।

শ্রীমন্তের কিঞ্চিৎ আগ্রহ জাগে, হাই তুলে বলে, কী বলে জপাচ্ছে ? ঠাকুরের থান তো বেগার খাটা তেভাগা নয় ?

দুলে তার ঝাঁকড়া চুল পিছন দিকে ঠেলে দেয়। চুলে তার কটা রং ধরেছে, বিশেষ পালাপার্বনে কদাচিৎ একটু তেল পড়ে। চুলে অসংখ্য উকুনের বাসা, মাঝে মাঝে সে পাগলের মতো মাথা চুলকায় তখন মনে হয় রাগে বুঝি নিজের চুল ছিঁড়ছে, বাগ্‌দিপাড়ার অবাধ্যতার রাগে !

শোনো তবে কী বলে। পাপ কথা মুখে উচ্চারণ কবতি মোর গা কাঁপে। বলে মোরা খাটি খাই, মোরা ছোটো কীসে, মোরা সজ্জাত হব। মোরা বজ্জাতি ধরম করম মানবো নাই।

সজ্জাত কী রে ?

ঠাকুরমশাইরা তোমরা বাবুরা যে জাত, তাব চেয়ে উঁচু জাত, ভালো জাত।

ও, সৎ জাত। উঁচু জাত।

দুলে মাথা হেলিয়ে সায় দেয।---হাঁ সজ্জাত। বলে, বম্ভান্ড সংসার পালটে গেছে, বামুনের চেয়ে সেরা জাত এয়েছে পিথিমিতে, মজুরের জাত, খাটিয়েব জাত। যে খাটবে সে জাতের লোক, বাস। আর সব বেজাত বজ্জাত। কেন ? না, তারা চোর ছ্যাঁচোড়। কেন ? না যারা খাটে তাদের অন্ন চুরি করে খায়। চোর বেজাতের দেবতা ধরম মোরা মানি না, মোরা সজ্জাত।

বলতে বলতে দুলে বাগ্দি কেঁদে ফেলে, কুলি খাটা ছোঁড়াছুঁড়ি মোর পাড়া সমাজ বেদখল করলে গো ! তুমরা এর বিহিত কর !

ভাত খেয়ে তামাক টানতে টানতে শ্রীমন্তের ঢুল আসছিল। বাগ্দি পাড়ায় আবার বিদ্রোহ ! জোয়ানদের মধ্যে কিছুটা বেয়াদপি বেড়েছে এই পর্যন্ত, দুটো গুঁতো খেলে ঢিট হয়ে যাবে। সমাজেব মাতব্বরকে সবাই মেনে চলবে এটা উচিত এবং দরকাব। মাতব্বব নিজে অনুগত থাকে, দশজনকে বশে রাখার যোগ্যতাও অবশ্য মাতব্বরের কিছুটা থাকা দবকাব।

শ্রীমন্ত ধমকে বলে, কাঁদিস না ব্যাটা, মেয়েছেলেব মতো কাঁদতে লেগেছে ! সাধে কি তোকে কেউ মানে না ?

দুলে ভাবাবেগ সামলে মাথা উঁচু করে গর্বের সঙ্গে বলে, তোমরা হলে মা-বাপ, তোমাদের ঠেঁয়ে কাঁদতে পারি। না তো দুলে বাগ্দি কেমন মরদ দশটা গাঁয়েব মানুষ জানে।

শ্রীমন্ত ব্যঙ্গ করে বলে, মরদ যদি তো ধরে ঠেঙিয়ে দিতে পারিস না ব্যাটা ?

উই তো মোর পোড়া কপাল ! হাউমাউ করে ওঠে দুলে, তোমরা বুঝবে নি। ই যে সামাজিক অমান্যি গো, জেতেব ব্যাপার, ঠেঙাব কাকে ?

সামাজিক বৈঠক ডেকে বিচাব ও শাস্তিব ব্যবস্থা কবাব চেষ্টা কি আর করেনি দুলে কিন্তু কে মানছে বিচার, কে মাথা পেতে নিচ্ছে শাস্তি ? যাদেব জাতে ঠেলবে একঘরে করবে তারাই যে বর্জন করেছে যে কজন দুলের পক্ষে আছে তাদের। খুঁটিতে বেঁধে যে ঠেঙাবে, মাথা মুড়োবে, ছ্যাঁকা দেবে, তার উপায় কই ? ওরাই যে উলটে তাদেব পিটিয়ে দেবার মতো দলে ভারী। দুলে বরং জাত ধর্ম ঠাকুর দেবতা চিরকালেব রীতিনীতির কথা বুঝিয়ে বুঝিযে, কারণে অকারণে পচাই-খাওয়া সামাজিক পরব-ফুর্তির ব্যবস্থা করে, তাতে মেয়েমদ্দব মেলামেশার নীতিনিযম আরও শিথিল করে কিছুটা প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রেখেছে। নইলে সব চুরমার হয়ে যেত এতদিনে। কিন্তু—

মোর আর খ্যামতা নাই। ইবারে তোমরা বিহিত কব !

শ্রীমন্তর আবার ঢুল আসছিল। সে বলে, আচ্ছা, আচ্ছা। কে কে পান্ডা নাম বল তো। বিশে শিবু ?—

উপরে ভাদ্র শেষের মাথা ফাটা রোদ, তলায় বর্ষায় পরিপূর্ণ জলা-পুকুর ভিজে মাটি থেকে গরম ভাপ উঠছে। বাগ্দিপাড়ার দিকে চলতে চলতে দুলে হিংসার আনন্দে চোখে প্রায ঝাপসা দেখতে থাকে। হোক বিহিত, চরম বিহিত হোক। তার প্রতিপত্তি তার অধিকার নষ্ট হবার বদলে বাগ্দি-পাড়াটাই যদি আগুনে পুড়ে যায়, বাগ্দি জাতটাই ধ্বংস হয়ে যায়, তাতেও দুলের আপত্তি নেই ! তার দেবতা অপদেবতাদের কাছে দুলে মাথা কপাল খুঁড়ে প্রার্থনা জানায়। বলি মানত করে।

বাগ্দিপাড়ার জলকাদা শীতকালের আগে শুকোবে না, শুকোবার আগে পচে যায়। গ্রামের বাইরে নিচুজমিতে তাদের কুঁড়ে বাঁধবার ঠাঁই, সাধ করে মানুষ সেখানে থাকে না। গোড়ায় রাজা জমিদারের প্রজা-ঠেঙানো লেঠেল-পুলিশি আর বেগারদারির বিনিময়ে সামান্য জমি পেয়েছিল, একটা বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। লাঠি মাঝে মাঝে আজও ধরে, তবে পেশা হিসাবে তুচ্ছ হয়ে গেছে। জমির

টুকরো নানাভাবে খসে গেছে, বৃত্তির বদলে পূজাপার্বণে চিঁড়ে-মন্ডা সিধে পায় কিন্তু রীতি হিসাবে বেগারখাটা ঠিক বজায় রয়ে গেছে। আর আছে তাদের দুর্ধর্ষ বন্য ও বোকা করে রাখার জন্য খাওয়া-পরা চলা-ফেরা ধর্ম-কর্ম সমাজ-গড়া ইত্যাদি ব্যাপারে যে সব বর্বর রীতিনীতি ব্যবস্থা চাপানো হয়েছিল তার অবশিষ্ট পরিশিষ্ট।

আছে মানে এই সেদিনও ছিল। যুদ্ধের বাস্তব ধাক্কায় এখন যায় যায় অবস্থা। কাছাকাছি যুদ্ধকালীন কারখানা বসায় ধাক্কাটা লেগেছে প্রচণ্ডভাবে, জীবিকার তাগিদে বুড়ো আর মাতব্বরের বাধা নিষেধ অমান্য করে কারখানায় খাটতে গিয়ে অনেকে হয়ে এসেছে সমাজ-ভাঙা বোমা। নতুন আশা আর নতুন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পেয়ে কত অল্পদিনে কী অদ্ভুতভাবে যে প্রাণবন্ত সচেতন হয়ে উঠেছে অন্ধকারের বদ্ধ পশুগুলি ! তারা মাতিয়ে দিয়েছে বাগ্‌দিপাড়ার পচাই খাওয়া মেয়ে পুরুষকে, যথেচ্ছাচারী ব্রাহ্মণের ছায়া-ভীরু অপদেবতার আতঙ্কে বিহ্বল মারামারিতে পটু খেতমজুর জেলে মাঝি চাটাই-বোনা ঘরামি-খাটা বাগ্‌দিদের। উঁচুতলার মানুষের আচার নিয়মের বাঁধন থেকে মুক্তি ভোগের ফলে এতদিন যা ছিল তাদের বর্বরতার পাশবিক সাহস—লাঠি হাতে খুন করতে খুন হতে ভয় না পাওয়া—চেতনার ছোঁয়াচ লাগা মাত্র তা পরিণত হতে আরম্ভ করেছে তেজে, মুক্তি কামনায়।

এই তেজের প্রমাণ দুলে প্রত্যক্ষ করে। এই প্রচণ্ড রোদে শতাধিক বাগ্‌দি মেয়ে পুরুষ কোদাল খন্তা নিয়ে ঠাকুরের থান খুঁড়ছে—এক পাশে চার-পাঁচহাত চওড়া সুড়ঙ্গ কাটছে বেদিতে।

এ কী দুঃস্বপ্ন দেখালে ঠাকুর ? এ কী সর্বনাশ ঘটালে ? বাগ্‌দি সমাজের বিদ্রোহ দমনের বিহিত করতে এক সকাল সে কত্তাবাড়ি আর নায়েববাবুর বাড়ি ধন্না দিয়েছে, তার মধ্যে জগৎ ওলট পালট হয়ে গেল ? অপরাধ কি হয়েছে কোনো ? ঠাকুরের থানে ধন্না দিতে সে তো কসুর করেনি, হত্যা দিয়ে পড়ে থাকতে থাকতে তার যখন মনে হয়েছে ঠাকুর নিজে ফিসফিস করে শিস্ দিয়ে আদেশ দিলেন কত্তাবাবুর কাছে বিহিতের ব্যবস্থা করতে যাওয়ার জন্য, শুধু তখনই তো সে ওদিকে ধন্না দিতে গিয়েছে।

উন্মাদের মতো ছুটে গিয়ে দুলে চিৎকার করে : সব্বোনাশ হবে, সব্বোনাশ হবে ! ঠাকুরের থানে কোদাল ছোঁয়ালি ?

শিবু কোদাল ধরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, বাবুদের ঠাকুর ঘরে নালা থাকে। মোরা একটা জল নিকেশের নালা করে দিচ্ছি। ঠাকুরের থান তোমার ঠিক রইবে।

পালা ! পালা সব ! কত্তাবাবুকে খবর দিয়ে এয়েছি, পুলিশ আসছে, মিলিটারি আসছে। পালা, পালা, সব পালা !

সকলে এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়।

দুলালি কচি বয়সে কারখানায় খাটতে গিয়ে জাত-ধর্ম সব নষ্ট করেছে। উথলে উঠেছে তার যৌবন। খন্তা হাতে এগিয়ে গিয়ে সে বলে, আরে বুড়া তোর মরন নাই ? খপর দিছিস ?

খন্তার ঘায়ে মাথা ফেটে হুমড়ি খেয়ে পড়ে দুলে। রক্তে তা রুক্ষ কটা চুলে চাপ চাপ জটা বাঁধতে থাকে। ঠাকুরের থানে নালা কাটা হলে বাড়তি বদ জলের স্রোত প্রবল বেগে বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করলে সকলে ধরাধরি করে দুলেকে সেই স্রোতে ভাসিয়ে দেয়।